অবন্তীনগর

স্বপ্নময় চক্রবর্তী

আজ মাতা জগদ্ধাত্রীকে স্মরণ করিয়া আমি এই বৃদ্ধ বয়সে আমার কিছু স্মৃতিকথা লিখিতে বসিলাম। চোখের জ্যোতি ক্রমশ কমিয়া যাইতেছে, সুগার ২৬০, আর ছাতে উঠিতে পারি না। পরে আর লিখা হইবে না, তাই এইবেলা লিখিতেছি। ইহা পড়িয়া আমার বংশধরদিগেরা জানিতে পারিবে কিরূপ পরিশ্রম ও সংগ্রাম করিয়া ও বুদ্ধি খরজ করিয়া আমি কীরূপে এই সংসার নিজে হাতে ডাঁড় করাইয়াছি। আজ আমার শরীরে বড় হাহাকার বাজে। তবে সে কথা বেশি লিখিব না, ঈশ্বরের করুণার কথাই লিখিব। আমি প্রথমে আমাদের বংশের ইতিহাস সম্পর্কে দুই চারি কথা বলি। আমরা সুবর্ণবণিক। সুবর্ণবণিকদের দুই ভাগ। আমরা সপ্তগ্রামী। আর এক ভাগের নাম রাঢ়ী। সপ্তগ্রামীদের সহিত রাঢ়ীদের বিয়েথা হইত না, কিন্তু আমার একমাত্র কন্যা রেখাকে রাঢ়ী ঘরে দিয়াছি। সে সুখেই আছে। আর আমার একমাত্র কনিষ্ঠ পুত্র কুটু (উত্তমচাঁদ) বাঙাল ঘরের মেয়ে আনিয়াছে। আমাদের কাহারও মত ছিল না। কিন্তু কুটুর বৌ বড় ভালই হইয়াছে। আমার অন্য বৌমাদের মতো দেখন্তি দেখন্তি ভাব নাই। অন্য বৌমাদের মতো কথায় কথায় রিস্‌কো চাপে না। যাহা বলিতেছিলাম, পিতার কাছে শুনিয়াছি আমাদের আদি নিবাস ছিল সপ্তগ্রামে। যখন লোকাল ট্রেনে চাপিয়া বর্ধমানের দিকে যাই, তখন আদি সপ্তগ্রাম স্টেশনটির দিকে তাকাই, কীরূপ টিম টিম করিতেছে। আর সরস্বতী নদীটিও কীরূপ তিরতির করিয়া বহিতেছে। অথচ পাঁচশত বৎসর পূর্বেও এই নদীতে চোদ্দোপাল-আঠারোপালের জাহাজ চলিত। সপ্তগ্রাম বন্দরে আরব দেশ, মিশর দেশ, জাভা-বালি হইতে সুগন্ধি মশলার জাহাজ আসিয়া ভিড়িত। গন্ধবণিকগণ ঐ সুগন্ধ দ্রব্যের কারবার করিতেন, আর শুনিয়াছি আমাদের পূর্বপুরুষগণ সোনা চাঁদির কারবার করিতেন।

আমরা তাই আজও আমাদের নামের সঙ্গে চাঁদ যুক্ত করিয়া থাকি। কিন্তু আমার পুত্রগণ ইহা আর মানিতেছে না। আমার নাতিদের নাম অমিতাভ, সৌমিত্র, অভিজিত ইত্যাদি। তবে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র কমলচাঁদের পুত্রের নাম স্বপনচাঁদ। আমার বংশ হইতে চাঁদ শব্দটি লুপ্ত হইবার পথে। সল্টলেকে বাড়ি করিবার সময় পাণ্ডুয়া গিয়াছিলাম বালির খোঁজ করিতে। শুনিলাম পাণ্ডুয়ার বালি নাকি সরস্বতী নদীর বালি। অবাক হইয়া গেলাম। তার মানে কী বিরাট চওড়া ছিল ওই নদী। আর আজ তার কী দুর্দশা। আমি পাড়ার শান্তি ইনস্টিটিউটের ফাংশানে ধীরেন বসুর কণ্ঠে একটি গান শুনিয়াছিলাম—চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়। আমি আমার নাতি-নাতনিদেরও এই কথাই বলি। আজ নাথের বাগানে বাড়ি, সল্টলেকে বাড়ি, পরে সব ফিনিশ হইয়া যাইতে পারে। আমি দুইটি বাড়ি করিয়াছি বটে, কিন্তু আমার পিতার খুবই দরিদ্র অবস্থা ছিল। অথচ আমার পিতামহর ছিল বিলাতি কাপড়ের কারবার। এক নৌকা কাপড় কলিকাতা হইতে পাটনা যাইবার সময় নৌকাডুবি হইয়া তিনি সর্বস্বান্ত হন। তারপর খুব দুর্দশায় জীবনপাত করেন। অথচ আমরা মহারাজ হর্ষবর্ধনের ফ্যামিলির লোক, যে হর্ষবর্ধনের কথা ইতিহাস বইতে লেখা আছে। শুনিয়াছি, হর্ষবর্ধনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্ধন আমাদের বংশের আদিপুরুষ। রাজা হর্ষবর্ধন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু রাজ্যবর্ধন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিলেন না। তিনি কান্যকুব্জ ত্যাগ করিয়া সপ্তগ্রামে চলিয়া আসিলেন। পাঠানরা আমাদের মল্লিক উপাধি দিয়াছিলেন। আমরা এখনও দে মল্লিক লিখি। আমাদের জ্ঞাতিরা অনেকেই দে বাদ দিয়া শুধু মল্লিক লিখিতেছে। কিন্তু আমি ইহার পক্ষপাতী নই। এই দে শব্দটি আসিয়াছে দেব হইতে। রাজারাজড়াগণ আমাদের খুব তোয়াজ করিত। তাহাদের নিকট আমরাই দেব, কারণ আমরা সওদাগর। অবন্তীনগরে ছিল এক সওদাগর....। লক্ষ্মীর পাঁচালিতে এখনও রহিয়া গিয়াছে। অবন্তীনগর কোথায় আমরা জানি না। সপ্তডিঙা মধুকর আমাদেরই। আহেরিটোলার নাথের বাগানের বর্তমান ভদ্রাসনটি নির্মাণ করিবার সবয় ভিত খোঁড়া হইতেছিল, তখন মাটির তলায় একটি ভাঙা

নৌকার সন্ধান পাইয়াছিলাম। পূর্বে আহেরিটোলা গঙ্গাগর্ভে ছিল। আমার মনে হইল উহা আমার পূর্বপুরুষের নৌকা। ওই নৌকার কালো কাঠের মধ্যে ফাটলের দাগগুলিতে যেন আমার পূর্বপুরুষের নখের আঁচড় লাগিয়া আছে। আমার পিতামহের নৌকাটিও ডুবিয়া গিয়াছিল। ডুবন্ত নৌকাটিকে কি তিনি শেষবারের মতো খামচাইয়া ধরেন নাই? ওই কোদাল খুবলানো মাটিতে আমার হারানো নৌকার পালখানি মাটি হইয়া মাটিতে মিশিয়া আছে। আমার মেয়ের ঘরের নাতি-নাতনি, পাপু ও রিমা যদি এই পৃষ্ঠাটি পড়ে, আমি জানি সে ফাটল কে ফাট্ল্ পড়িবে। যেমন বট্ল্। কারণ তাঁহারা ইংলিশ মিডিয়াম, তাহারা জানে না ওই ফাটলের চিহ্ন আঁকা ভাঙা নৌকাটি এই বাড়ির তলাতেই আছে। নৌকাটিকে সরাই নাই। এই নৌকা কোন কালে অবন্তীনগর হইতে যাত্রা করিয়াছিল। আমার বড়ো পুত্র সল্টলেকে থাকে। যে বাড়িটিতে পাপু ও রিমা থাকে, তাহা সরস্বতী নদীর বালি দিয়া তৈয়ারি। তাহারা জানে না ওই বাড়িটিতেও অবন্তীনগর লাগিয়া আছে। সরস্বতী নদীর ধারে সপ্তগ্রাম বন্দরের অদূরে আমাদের শহর ছিল। উহাই কি অবন্তীনগর নয়? অবন্তীনগর হইতে চারিশত বৎসর পূর্বে আমার পূর্বপুরুষ সুতানুটি আসিলেন। কেন আসিলেন? কারণ সরস্বতী নদী ক্রমশ রোগা হইতেছিল। তখন সুতানুটিতে অনেক তাঁতি থাকে। শেঠ-বসাকদের নিকট থেকে দাদন লইয়া বস্ত্র বুনিত। ভাবিলেন কারবার এখানেই ভালো হইবে। তা ছাড়া তখন কোম্পানি হইয়াছিল। সাহেবি কোম্পানি। ইস্ট ইন্ডিয়া। তাঁহারা মালদহে কুঠি করিয়াছিল। হুগলিতেও। পিতার মুখে শুনিয়াছি আমাদের পূর্বপুরুষ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সহিত সাপ্লাই বিজনেস করিতেন। আমাদের পূর্বপুরুষ রাজারাম মল্লিকের সহিত জোব চার্নকের বন্ধুত্ব হইয়াছিল। শুনিয়াছি চার্নক সাহেব নাকি রাজারাম মল্লিকের ভদ্রাসনেও গিয়াছিলেন। ফুলকো লুচি খাইয়া হাউ ওয়ান্ডারফুল বলিয়াছিলেন। সত্যমিথ্যা জানি না, ইহাও শুনিয়াছি, সাহেব নাকি একটি সোনার গিনি দিয়াছিলেন, উহা নাকি খুবই পয়া ছিল, সেই গিনি দিয়া জগদ্ধাত্রীর হারের লকেট তৈয়ার হয়। ভাগাভাগির সময় শশীভূষণ দে

স্ট্রিটের গোলকবাবুদের বাড়ির জগদ্ধাত্রীর গলায় ওই লকেটটি রাখিবার জন্য তাঁহারা মেছুয়াবাজারের অংশীদারদের ওই লকেটের পরিবর্তে চারটি বাড়ি, দমদমার বাগানবাড়ি ত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই দমদমার বাগানবাড়িটি পরে বাঙালরা জোরদখল করিয়া কলোনি করে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সহিত কারবার করিয়া শেঠ বসাকরা, বেশ দুপয়সা কামাই করিয়া ছিল। দেখাদেখি ধর, দত্ত, আড্ডি (আঢ্য), লাহারা আসিল। কোথা হইতে নীলমণি ঠাকুরও আসিয়া পড়িলেন। নীলমণি ঠাকুরই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরদের পূর্বপুরুষ। পিতার মুখে শুনিয়াছি রাজারাম মল্লিকই চার্নককে উপদেশ দিয়াছিলেন মালদহ-হুগলি ছাড়িয়া সুতানুটিতে আসিয়া কুঠি করিতে।

যাহা হউক, এইরূপে কারবার চলিতে লাগিল। আমার প্রপিতামহের নাম রূপচাঁদ দে মল্লিক। তাহার দুই পত্নী ছিলেন। দুই পত্নীর গর্ভে সাত পুত্র হইয়াছিল। আমার পিতামহ ছিলেন সবচেয়ে ছোটো। পিতামহের নাম এজন্য ছিল ছোটচাঁদ। কলিকাতায় তখন জাহাজে করিয়া বিলাতের বস্ত্র আসিত। তিনি বিলাতি বস্ত্র কিনিয়া বিভিন্ন স্থানে পাইকিরি বিক্রি করিতেন। পালতোলা বড়ো নৌকার এক নৌকা মাল কালবৈশাখীর প্রবল ঝড়ে গঙ্গায় ডুবিয়া যায়। কিছুদিন পরে তিনি বিষ খাইয়াছিলেন। আমি আমার পিতামহকে কোনোদিনই দেখি নাই, তাঁহার কোনো ছবিও নাই। কিন্তু আমি মাঝে মাঝে তাঁহাকে স্বপ্নে দেখি। ধুতির ওপরে কালো কোট, গলায় সোনার চেন, মাথায় পাগড়ি। তিনি ম্যানচেস্টার ম্যানচেস্টার বলিতে বলিতে গঙ্গা-কিনার হইতে ছুটিয়া আসিতেছেন। আমার পিতামহ ছোটচাঁদ দে মল্লিক যখন সুইসাইট করেন তখন আমার পিতার বয়স মাত্র যোলো বৎসর। আমার পিতার ওপরে আরও দুই ভাই ছিল। তাঁহারা আমার জ্যাঠা। বড়ো জ্যাঠামহাশয়ের বয়স তখন বাইশ বৎসর মাত্র। তিনি নতুন উদ্যমে আবার কাপড়ের কারবার শুরু করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন দেশে অন্যরকমের হাওয়া।

বিলাতি বস্ত্র পোড়াইয়া দিতেছে। তখন মুকুন্দদাস গান বাঁধিয়াছেন— ফেলে দাও রেশমি চুড়ি বঙ্গ নারী ও হাতে আর পোরো না। পিতার নিকট

শুনিয়াছি—নয়ানকৃষ্ণ সাহার গলির যে বাড়িতে তাহারা থাকিতেন, সেই বাড়ির সম্মুখে হলুদ টুপি পরা স্বদেশীরা বিলাতি বস্ত্র পোড়াইয়া দিয়াছিল, এবং চিৎকার করিয়া আমার জ্যাঠাদের বলিয়াছিল—বল শালা, বন্দেমাতরম বল। আমার জ্যাঠারা ভয়ে ভয়ে বন্দেমাতরম বলিয়াছিল কিন্তু আমার পিতা মনের আনন্দে বন্দেমাতরম বলিতে বলিতে নীচে নামিয়া গিয়াছিলেন। পিতার নিকটে জে. এম. সেনগুপ্তের অনশনে মৃত্যুবরণের কথা শুনিয়াছি, আমাদের সুবোধ মল্লিকের কথাও শুনিয়াছি, যিনি দেশীয় শিক্ষা প্রসারের জন্য একলক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। নয়ানকৃষ্ণ সাহার গলি গঙ্গার কাছেই। যে দিন বঙ্গ ভঙ্গ হইল, সেই দিন নাকি দলে দলে লোক গঙ্গা স্নান করিয়া বন্দেমাতরম বলিতে বলিতে একজন অন্যজনের হাতে রাখি পরাইয়া দিয়াছিল। আমি এই বন্দেমাতরম শব্দ কত রকমে শুনিলাম এ জীবনে। আমি ক্ষুদিরাম-কানাইলাল বাঘাযতীনের কণ্ঠে বন্দেমাতরম শুনি নাই বটে, কিন্তু গণেশ ঘোষ, হেমন্ত বসু, শচীন মিত্রের কণ্ঠের বন্দেমাতরম শুনিয়াছি বিয়াল্লিশ সালে। তখন ভারত ছাড়ো আন্দোলন চলিতেছে। ছেচল্লিশ সাতচল্লিশের দাঙ্গার সময় বন্দেমাতরম ধ্বনি অন্যপ্রকার। তখন ওই আওয়াজ শুনিলেই বুঝিতাম খোকা, ভুনা, জগা ইত্যাদিদের বাহিনী হাতে ছোরা লইয়া চলিল। ভোটের সময় বন্দেমাতরমের অন্য কায়দা। প্রফুল্লকান্তি ঘোষ মহাশয়ের মুখে মিহি বন্দেমাতরম শুনিয়াছি, আবার যখন নব কংগ্রেস হইল, তখন বন্দেমাতরমের সুরটা ইনকিলাব জিন্দাবাদের ন্যায় হইয়া গেল। সেই কবে বঙ্কিমচন্দ্র এই মন্ত্র দিয়া গিয়াছেন এখনও চলিতেছে। আমি বঙ্কিম রচনাবলী কিনিয়াছিলাম। বিশেষ পড়া হয় নাই। বইগুলি শিবু নিয়া গিয়াছে। বেশ কয়েক বৎসর পূর্বে শিবুর ঘরের তাক হইতে একখণ্ড বঙ্কিম রচনাবলি টানিয়া নিলাম, দেখি বঙ্কিম রচনাবলীর পিছনে একটা হুইস্কির শিশি। শিবু মদ রাখিবার আর জায়গা পাইল না। আমার এই সেজ ছেলেটিকে নিয়া আমার বড়োই চিন্তা। উহাকে নিয়াই আমার হাহাকার। বাবা তারকনাথের নিকট প্রার্থনা তিনি তাহাকে সুমতি দিন। শিবরাত্রির দিন জন্মাইয়াছিল

বলিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিলাম শিবু। হে শিব, তুমিই তাহাকে দেখিও। আবার অন্যকথায় চলিয়া গেলাম। বৃদ্ধ বয়েসের ইহাই দোষ। যাহা বলিতে ছিলাম। আমার পিতামহ ছোটচাঁদের তিন পুত্র। হৃদয়চাঁদ, পরানচাঁদ ও নয়নচাঁদ। নয়নচাঁদ আমার পিতা। আমরা দুই ভাই, এক বোন। আমি জ্যেষ্ঠ। আমি সত্যচাঁদ, আমার ছোটভাই পূর্ণচাঁদ। মা জগদ্ধাত্রীর আশীর্বাদে আমার পাঁচপুত্র ও একমাত্র কন্যা।

আমার ভাইয়ের মতো পুত্র সন্তানের জন্য তারকেশ্বরে বাবার কাছে ধন্যা দিতে হয় নাই। আমার ভাইয়ের পরপর চারিটি কন্যা সন্তান হয়। তারপর বাবার কাছে ধন্যা দিয়া একটি পুত্রসন্তান পায়। ভারি মিষ্টি। ভারি বুদ্ধিমান। প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হইল, যে প্রেসিডেন্সিতে সুভাষ বোস পড়িতেন, সেই ভাইপো একদিন হট করিয়া গুলি খাইয়া মরিল। ১৯২২ সাল। সে নাকি নকশাল করিত। দুর্গাচরণ মুখার্জীর গলির সম্মুখের একটি ছোটো মাঠে শহীদ বেদী ছিল। উহাতে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র তারকচাঁদের নাম ছিল। কত রকমের শহীদ বেদী দেখিলাম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যাহারা যুদ্ধ করিয়া জীবন দিল, তাহাদের শহীদ বেদী দেখিলাম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যাহারা যুদ্ধ করিয়া জীবন দিল, তাহাদের শহীদ বেদী আছে আকাশবাণীর রেডিও সেন্টারের কাছে। ব্রিটিশের সহিত যাহারা সংগ্রাম করিল তাহারও শহীদ। স্বাধীনতা আন্দোলনের শহীদ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সৈনিকের শহীদ বেদী। স্বাধীনতা পাইবার পরও কত রকমের শহীদ বেদী হইল। ট্রাম আন্দোলনের শহীদ, খাদ্য আন্দোলনের শহীদ, নকশাল আন্দোলনের শহীদ...। কিছুদিন আগে বাগবাজারে ভাইয়ের বাড়িতে গিয়াছিলাম। দুর্গাচরণ মিত্রের গলির সম্মুখে গাড়িটি থামাইয়া শহীদ বেদীটি দেখিতে চাহিয়াছিলাম। পাইলাম না। শুনিলাম যেই মাঠে শহীদ বেদীটি ছিল, সেখানে একটি মেয়েদের চুলকাটার সেলুন হইয়াছে। বেদীটি ভাঙিয়া দেয়া হইয়াছে। পরে জানিলাম ওই টুকরো জমিটি শীলেদের। শীলেদের গৃহবধূরা ওই চুলকাটার দোকানটি খুলিয়াছে। হায়! ১৯৫০ সালেও বন্ধ ঘোড়ার গাড়ি ছাড়া শীলেদের ঘরের বৌরা বাহির

হইবার কথা ভাবিতে পারিত না। বারবার অন্যকথায় চলিয়া যাইতেছি। আমার পিতার কথা বলিব। পিতাকে প্রথমেই পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতাহি পরমংতপঃ বলিয়া পূজা করিয়া নিই। তিনি যেরূপ কষ্ট ও সংগ্রাম করিয়া আমাদের সংসারকে রক্ষা করিয়াছেন তাহা ভাবিলে আজিকার দিনে চক্ষু সজল হইয়া উঠে। পূর্বেই বলিয়াছি আমার পিতামহের বিজনেসে লস্ হইয়াছিল বলিয়া তিনি সুইসাইট করিয়াছিলেন। তাঁহার একনৌকা মাল গঙ্গায় ডুবিয়া গিয়াছিল। তিনি কোন ক্রমে সাঁতার দিয়া পাড়ে আসিয়াছিলেন। পরে ওই বিজনেস আর দাঁড় করাইতে না পারিয়া, পাওনাদারদের তাড়ায় বেতিব্যস্ত হইয়া তিনি শেষ পর্যন্ত নাবালক পুত্র রাখিয়া বিষ খাইয়াছিলেন। আমার জ্যাঠা মহাশয়গণ একেবারে অথৈ জলে পড়িল। আমার পিতার বয়স তখন ষোলো। আমার পিতা ঠিক করিলেন বিলাতি বস্ত্রের ব্যবসা আর করিবেন না। তখন বিলাতিবস্ত্র বয়কট চলিতেছে। তখন আমাদের সুবর্ণবণিক সমাজের মনীষী কুঞ্জবিহারী সেন বস্ত্রের ব্যবসায়ে নামেন। স্বদেশীবস্ত্র দিয়াও যে ব্যবসা করা যায়, হাতে কলমে তাহা দেখাইয়া দিলেন। কুঞ্জবিহারী সেন বম্বে, গুজরাট ইত্যাদি স্থানের মিলগুলিতে বাঙালির উপযোগী ধুতি শাড়ি ইত্যাদি তৈয়ারি করান। বড়োবাজারে বি. কে. সেন এন্ড কোম্পানি নামে দেশি কাপড়ের দোকান হইল। আমার পিতা ওই দোকানের কর্মচারী হিসাবে যোগ দিলেন। আমি বেশ কল্পনায় দেখিতে পাই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, এইসব মনীষীগণকে আমার পিতা কাপড় প্যাক করিয়া দিতেছেন। আমার পিতা ওই দোকানেই থাকিতেন। কোনোমতে রান্না করিয়া নিতেন। আমি যখন ইস্কুলে পড়ি আমার পিতা একদিন আমাকে লইয়া বড়বাজার গিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন এই দ্যাখ, এইখানে ছিল বি. কে. সেন এন্ড কোম্পানি। দ্যাখ, মাথাঘষার গলি। তখন তো শ্যাম্পুর চল ছিল না, তখন মেয়েরা একপ্রকার সুগন্ধি গুঁড়া দিয়া মাথা ঘষিত। এইখানে সার সার দোকানে মাথাঘষা বিক্রয় হইত। তারপর তিনি কহিলেন বিদ্যাসাগরের ঘর

দেখবি, ওই দ্যাখ, ১৩ নম্বর বাড়ি। দয়েরহাটা স্ট্রিট। আমার শরীর তখন ঝনঝন করিয়া উঠিয়াছিল। কিছুদিন আগেই জানিয়াছিলাম, ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বড়বাজারে ভাগবতচরণ সিংহের বাড়িতে থাকিয়া মাসিক দুই টাকা বেতনে চাকুরি করিতেন। আমি চারিদিকে তাকাই। কোথায় সেই গ্যাস পোস্ট? যাহার তলায় বসিয়া শিশু বিদ্যাসাগর পড়ালেখা করিতেন। এই বাড়িতে ভাগবতচরণের বিধবা কন্যা রাইমণি স্নেহমধুর কণ্ঠে ডাকিতেন ঈশ্বর, ঈশ্বর। এই দয়েরহাটা হইতেই হাঁটিয়া গোলদিঘি যাইতেন বিদ্যাসাগর। আমি আবেগে পিতার হাত ধরিয়া আছি। চারিদিক দেখিতেছি পাগড়িপরা মাড়োয়াড়িদের জটলা। মশলার গন্ধ। সারসার গোরুর গাড়ি। বিদ্যাসাগরের সময় বড়বাজার ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম। শেঠ, বসাক, মল্লিক, শীল, বড়ালেরা থাকিতেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই তিন চার মহলাযুক্ত ভবন ছিল, বাড়িতে নিম গাছ, জাম গাছ, আম গাছ ছিল, পুকুর ছিল, গঙ্গা পর্যন্ত কাঁচা পথ ছিল। আর আজিকার অবস্থা? বছর দশেক আগে পুরী হইতে ফিরিবার সময় হাওড়া স্টেশন হইতে গাড়ি আসিতেছিল হ্যারিসন রোড বরাবর। হঠাৎই বড়বাজার যাইতে ইচ্ছা করিল। পিতার কর্মস্থলের সেই দোকানটি নাই, দয়েরহাটা স্ট্রিটের নাম দেখিলাম দিগম্বর জৈন টেম্পল রোড হইয়াছে। আর সেই ১৩ নম্বর বাড়িটি ভাগ হইয়া ১৩এ, ১৩বি ও ১৩-র সি হইয়াছে। বাড়িটির সামনে একটি খইলের দোকান হইয়াছে। বাসিন্দারা জানেই না এই বাড়িতেই একদা....।

আমার পিতার প্রসঙ্গে বলিতে গিয়া বিদ্যাসাগরের কথায় চলিয়া গেলাম। আবার সেই স্থানে ফিরিয়া আসি। আমাদের পিতামহ একটি ভদ্রাসন তৈয়ারি করিয়াছিলেন। বাগবাজার ব্যোমকালীতলার নিকটে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের বাড়িটি এখনও রহিয়াছে। কিন্তু আমাদের প্রাচীন বাড়িটি নাই। কিছু বাড়ি নদীগর্ভে বিলীন হয়। আর কিছু বাড়ি বিলীন হয় রাস্তাগর্ভে। গিরিশ ঘোষের আদি বাড়িটিও রাস্তাগর্ভে বিলীন। আমাদের প্রাচীন বাড়িটাও। দেনার দায়ে আমাদের বসতবাটিটি বাগান সমেত বিক্রয়

করিয়া দিয়া নয়ানকৃষ্ণ সাহার গলিতে একটি ছোটো বাড়ি ক্রয় করিয়া বাবাজ্যাঠারা একান্নবর্তী ছিলেন। আমার পিতা বড়বাজারের দোকানেই স্বাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার চোখের সামনে অন্য স্বপ্ন। স্বদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। নয়ানকৃষ্ণ সাহার গলি হইতে গ্যালিফ স্ট্রিট অতি নিকটে। তখন গ্যালিফ স্ট্রিটের আলামোহন দাশের সঙ্গে আমার পিতার পরিচয় হইয়াছে ও বন্ধুত্ব হইয়াছে। ১১ নম্বর গ্যালিফ স্ট্রিটের একটি বাড়িতে খই-মুড়ি ভাজা হইত, বাতাসা তৈয়ার হইত। আলামোহন দাশ ওই বাড়িতে থাকিতেন, খই-মুড়ি ফেরি করিতেন। তিনি ও আমার পিতা প্রায়ই মারাঠা খালের ধারে বসিয়া কারখানা গড়িবার কথা আলোচনা করিতেন। আলামোহন দাশ হাওড়ায় একটি অ্যাসিডের কারখানা করিলেন। ইহার পরে পরে আলামোহন একের পর এক কারখানা পত্তন করিলেন। দাশনগর হইল। আজ দাশনগরের অবস্থা আমাদের সরস্বতী নদীটির মতই। কালের এমনই নিয়ম। আলামোহন দাশের সংশ্রবে থাকিয়া আমার পিতাও শিল্প স্থাপনের জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠিলেন। পুঁজি নাই, জমি নাই, সামান্য এক দোকান-কর্মচারী অবশেষে তৈয়ারি করলেন কালি-কল। সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। সেই ইতিহাসের বেশির ভাগই আমার অজানা, তবে কিছু কিছু জানি, তাহা এই বেলা বলিতে ইচ্ছা করে। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম নিজের কথা নিজের মনেই লিখিব, কাহাকেও দেখাইব না। কি বলিতে কি বলিব, পুত্র কন্যা বা নাতি নাতনিরা আঘাত পাইবে। এখন ভাবিতেছি আমাদের পুরাতন ইতিহাস তাহাদের জানা দরকার। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র কমল এখন সল্টলেকে বাস করে। তার পুত্র স্বপন কোনোদিনও নয়ানকৃষ্ণ সাহার গলিতে যায়নি। তাহার একবার চোখ চেয়ে দেখতেও ইচ্ছে করল না তাহার পিতা পিতামহ কোথায় বড়ো হইয়াছে।

আমার কারখানার আলমারিতে একটি ফাইলে আমার পিতার একটি ডায়েরির কয়েকটি পাতা যত্ন করিয়া রাখা ছিল। আজ কারখানা নাই, ফাইলটি কোথায় গিয়াছে জানি না। ওই ডায়েরিতে লেখা ছিল কালি তৈয়ারির আদি ফর্মুলা। তাহা আমার আজও মনে আছে।

লোধ লোহা লোহার গুঁড়ি।
অর্কাঙ্গার জবার কুঁড়ি॥
গাবের ফল হরিতকী
ভৃঙ্গার্জুন আমলকী
বাবলা ছাল জাঁটির রস
ডালিম সেজে করিবে কষ
ভেলায় কর‍্যা এক আলি
চারি যুগ না উঠবে কালি।

আরেকটা ফর্মুলা হল—
তিন ত্রিফলা শিমুল ছালা
ছাগ দুগ্ধে করি মেলা
তাহাতে হরিতকী ঘষি
ছিঁড়ে পত্র, না ছাড়ে মসি।

সব দেশীয় জিনিস। গাছগাছড়ার রস, আঠা, ফল। আমার পিতা ওই সব দ্রব্য দিয়া কালি তৈয়ারি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। স্বদেশী কালি। জানি না ওই ফরমুলা কোথা হইতে জোগাড় করিয়াছিলেন। সে সময় স্বদেশী দ্রব্য প্রস্তুতের চেষ্টা চলিতেছে। পি. সি. রায় আহ্বান করিয়াছিলেন। বেঙ্গল কেমিক্যাল তখন খুব ভালো চলিতেছে। দে-রাও একটি ওষুধের কোম্পানি খুলিয়াছিলেন। বেশ কিছু স্বদেশী সাবান ছিল তখন। স্বদেশ-সাবান, বাঙালি পল্টন সাবান ইত্যাদি। আমার পিতাও স্বদেশী কালি তৈয়ারির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দেশীয় পদ্ধতিতে কালি তৈয়ারির খরচ অনেক বেশি। তখন পি. এম. বাক্‌চি কালির বড়ি তৈয়ারি করিত। সেই কালির বড়ি জলে গুলিয়া দোয়াতে ভরিয়া কলম ডুবাইয়া লিখিতে হইত। ৬৫-৬৬ সাল পর্যন্ত আমিও ওইরূপভাবেই লিখিতাম। আজ নাতি-নাতনিদের নিত্যনূতন ডটপেন। এখানে ওখানে গড়াগড়ি দিতেছে। আমার পিতার মনে হইয়াছিল তিনি

কালির কারখানাই করিবেন। সেই কালি ঘরে ঘরে পৌঁছিয়া আমাদের দেশবাসী লেখাপড়া করিবে। আমার পিতা কাপড়ের দোকানের চাকুরি ছাড়িয়া পি. এম্ বাক্‌চির কোম্পানিতে চাকুরি লইলেন। সেখানে কালির বড়ি তৈয়ারি শিখিলেন। তারপর নিজে ব্যবসা শুরু করিলেন। লেখার কালির বড়ি তৈয়ার করিতে গেলে যে ডেক্‌সট্রিন লাগে তাহা বাজারে মিলিত না। পি. এম্ বাক্‌চি বিলাত হইতে ডেক্‌সট্রিন আনাইতেন। জলে রং গুলিয়া যে রূপে ময়দা মাখা হয়, সেরূপ রং গোলা জল দিয়া ডেক্‌সট্রিন মাখা হইত। সেই ডেকস্‌ট্রিনের রঙিন তালগুলিকে রোদে শুকাইয়া মেশিনে মিহি পাউডারে পরিণত করা হইত। সেই পাউডার দিয়া মেশিনের সাহায্যে ট্যাবলেট তৈরি হইত। কিন্তু আমার পিতা ডেক্‌সট্রিন কোথায় পাইবেন? রং জল দিয়া ময়দা মাখিয়া, রোদে শুকাইয়া প্রথমে মুগুর দিয়া ও পরে হামান দিস্তা দিয়া বহু কষ্টে গুঁড়া করিতেন। অতঃপর সেই গুঁড়া পুনরায় ডাইসে ফেলিয়া, মুগুর ও হাতুড়ি দিয়া পিটাইয়া ট্যাবলেট তৈয়ারি করিতেন। সেই ট্যাবলেটের নাম দিয়াছিলেন ভারত। কাগজের ছোটো ছোটো প্যাকেটে ভারত কালি নিজে হাতে বিক্রয় করিতেন। আমিও ভারত কালি লইয়া আহেরিটোলা বঙ্গ বিদ্যালয়, বাগবাজার হাইস্কুল, টাউনস্কুলে কত বিক্রয় করিয়াছি।

নয়ানকৃষ্ণ সাহার গলির ওই বাড়িটির ছাতই আমাদের আদি কালির কল। আমার পিতাই ওই কলের কেমিস্ট, সুপারভাইজার, ওয়ার্কার, ম্যানেজার, সেল্‌সম্যান ও দারোয়ান। ওই বাড়ির ছাতে বহুদিন ধরিয়া তাল পিটাইবার মুগুরগুলি ছিল। ওই মুগুরগুলিকে চিৎপুরের বাড়িতে পূজা করিতাম। ওই মুগুর তখন আর প্রয়োজন হইত না। ততদিনে মেশিন আসিয়া গিয়াছে। দাঙ্গার সময় খোকা, ভুনা, জগারা মুগুরগুলি লইয়া গেল। আমার পিতা কালির ব্যবসায়ে কিছুটা উন্নতি করিলে, দুর্গাচরণ মুখার্জীর ঘাটের নিকটেই চিৎপুর রোডের ওপরে বটকৃষ্ণ পালের একটি বাড়ি ভাড়া লইলেন। ওই বাড়ির এক তলায় ছিল আস্তাবল, দোতলা সহিসদের কোয়ার্টার। মোটরগাড়ির চল হইলে ঘোড়ার গাড়ির বিশেষ প্রয়োজন হইত

না। এত ঘোড়াও দরকার ছিল না। সেই কারণে তাঁহারা ভাড়া দিলেন। একতলার আস্তাবলে কালির কল হইল, ছাতে কালির তাল শুকাইত। দিনে রোদে, রাতে হাওয়ায়। বৃষ্টি আসিলে ত্রিপল ঢাকা দিবে কে? এই বিবেচনা করিয়া নয়ানকৃষ্ণ সাহার গলি হইতে আমার পিতা সপরিবারে চিৎপুরের বাসায় চলিয়া আসিলেন। ইতিমধ্যে আমার পিতা বিবাহ করিয়াছিলেন। আমার মামার বাড়ি মসজিদ বাড়ি স্ট্রিট। মামার বাড়ির কথা পরে বলিব। চিৎপুরের ওই কালির কলে আমি দেখিয়াছি কয়েকজন কর্মচারীর সহিত আমার পিতা ও মাতা দুই জনে কাজ করিতেছেন। পাউডার ডাইসে ফেলিয়া হাতুড়ি পিটাইয়া ট্যাবলেট তৈয়ারি করিয়া গণিয়া গণিয়া কৌটায় ভরিতেছেন। কৌটার গায়ে বাংলায় লেখা ভারত কালি। স্বদেশী কালি। আমরা দোতলায় থাকিতাম। গঙ্গায় স্নান করিতাম। আমাদের জামা কাপড় দেখিলে লোকে ভাবিত দোল খেলার জামা পরিয়াছি। বৃষ্টি আসিলে হই হই করিয়া ছাতে যাইতাম এবং কালির তালে ত্রিপল ঢাকা দিতাম। তখনও আজিকার মতো পলিথিন বাহির হয় নাই। ত্রিপলগুলি খুবই ভারী ছিল। যখন বৃষ্টি হইত, ছাতের পাইপ দিয়া লাল জল নীল জল পড়িত। আমি আশ্চর্য হইয়া পাইপের রঙিন জলের ঝরনা দেখিতাম। ওই বাড়িটি এখন গ্যাস সিলিন্ডারের গুদাম হইয়াছে। আমি আহেরিটোলা বঙ্গ বিদ্যালয়ে ভরতি হইয়াছিলাম। যে ইস্কুলে পড়িয়াছিলেন কত না মনীষী। আমার সঙ্গে পড়িত ছুকু। ভালো নাম সুধীন্দ্র লাহা। মস্ত বড়ো ইঞ্জিনিয়ার হইয়াছিল। হাওড়া ব্রিজ তৈয়ারিতে তাঁর হাত ছিল। চৌদ্দ তলা বাড়িটি, নিউ সেক্রেটারিয়েট, ছুকু নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া করিয়াছে। আমার নাথের বাগানের বাড়িটির প্ল্যানও ছুকুর করা। আমি যখন বাড়ি হইতে গুড় ছোলা টিফিন আনিতাম, ছুকুও তাহাই আনিত। অনেকের বাড়ি হইতে টিফিনের সময় চাকর আসিয়া দুধ সন্দেশ খাওয়াইয়া দিত। আমার সহপাঠীরা অনেকেই হাতের চেটোয় ঠোঁটের দু' মুছিতে মুছিতে ক্লাসে আসিত। আমি আর ছুকুই গরিব ছিলাম। ছুকুর সহিত আমার বন্ধুত্ব অটুট ছিল। ছুকুই আগে চলিয়া গেল।

আমি একদিন বসিয়া বসিয়া একটি লিস্টি করিতেছিলাম—আমার চেনা জানা আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে কত জন আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। ওই লিস্টি আশি ছাড়াইয়া গেল, আর বাড়াইলাম না। আমার পিতা অকালেই স্বর্গে গেলেন। আমার বিবাহের পর দুই বৎসর মাত্র বাঁচিয়া ছিলেন। মাতা ঠাকুরানী আরও দশ বৎসর কাল বাঁচিয়া ছিলেন। দাঙ্গার সময় আমার দুই শ্যালক কলুটোলার বাড়িতে একদিনে খুন হয়। ভ্রাতুষ্পুত্র তারকচাঁদও খুন হইল ৭২ সালে। তাহাকে লালঝাণ্ডা জড়াইয়া কাশী মিত্রের ঘাটে লইয়া গেল। মুখাগ্নির সময় তারকের বন্ধুদের মুখের ইনকিলাব জিন্দাবাদ ধ্বনিতে পুরোহিতের মন্ত্র শুনা যাইতেছে না। তারপর যখন ছেলেটি জ্বলিতেছে, তাঁর বন্ধুরা গান করিতেছে একদিন স্বপ্নের ভোর আসবে—না কি যেন। আর সেইদিনই অবাক হইয়া দেখি আমার দুলাল, আমার চতুর্থ পুত্র, উহাদের সহিত গান করিতেছে। আমি বুঝিলাম না আমার তখন কি করা উচিত ছিল। পরে দুলালকে অনেক বুঝাইয়াছি। বলিয়াছি—দেখ, কমিনিস্টি করে কি হবে। আমিও স্বদেশী কালি তৈয়ারি করেছি। কিন্তু বড়ো বড়ো কোম্পানির ফাউন্টেন পেনের কালি কি টিকিতে দিল স্বদেশী কালিকে? কত বলিলাম আগে নিজের ভবিষ্যৎ দেখ। আমাদের কালিদাস রক্ষিত, কত বড়ো দাতা, গরিবদের জন্যও কত দানধ্যান। আগে রোজগারপাতি করিয়াছিলেন বলিয়াই পরে দানধ্যান করিতে পারিয়াছিলেন। হাতের পাঁচ আঙুল সমান হয় না, তেমনি সব মানুষও সমান হয় না। মানুষের মধ্যে বেঁটে লম্বা, চালাক বোকা, গরিব বড়োলোক থাকিবেই। কমুনিস্ট পার্টি কি করিবে? জোর করিয়া গরিব বড়োলোক সমান করা যায় না। দুলাল বর্তমানে কী করে ঠিক বলিতে পারিব না। নিজের পাগল বউ লইয়া মনোকষ্টে আছে। বাড়িতে মিটিং, চা ইত্যাদি আর আগের মতো হয় না বলিয়াই মনে হয়। পনেরো বিশ বৎসর পূর্বে দুলালের ঘরে যাহারা আড্ডা দিতে আসিত তাহাদের পোশাকে চাকচিক্য ছিল না। তাহাদের জন্য মুড়ি তেলেভাজার বেশি আসিত না। এখন যাহারা আসে, আমি লক্ষ করিয়াছি, তাহাদের বাহারি পোশাক। খবর লইয়াছি তাহাদের

জন্য কেক, প্যাটিস, ইত্যাদি খাবার আসে। দুলালকে এখন বলি— বাবা দুলাল, তোমার এরূপ বিবাহের জন্য আমিই দায়ী। তুমি তো নিজে ভাব ভালোবাসা করিয়া বিবাহ করো নাই, যেমন কুটু করিয়াছে। তোমাকে আমিই বিবাহ দিয়াছি। আমি পিতা হইয়া তোমার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি। আমায় ক্ষমা দিবে না? দুলাল, আমি তোমাকে ব্যবসার জন্য বিশেষ টাকা পয়সা দিতে পারি নাই। কীরূপে দিব?

এবার আমি আমার কালির ব্যবসার কথা বলি। পিতার মৃত্যুর পর ওই ব্যবসা আমি আমার নিজের হাতে গ্রহণ করিলাম। দেশ স্বাধীন হইল। জওহরলাল প্রধানমন্ত্রী, বি. সি. রায় মুখ্যমন্ত্রী। আমার কোম্পানির নাম রাখিলাম নবভারত ইন্‌ক কোম্পানি। বি. সি. রায় বলিলেন নিরক্ষরতা দূর করিবেন। আমি কয়েকজন সেল্‌সম্যান নিয়োগ করিলাম। পূর্ব বাংলা হইতে তখন রিফিউজি আসিতেছে। আহেরিটোলার দত্তবাড়িতে একজন পূর্ববঙ্গীয় লোক এস্টেট ম্যানেজার হিসাবে নিযুক্ত হইল। তাঁহার সততার কথা শুনিলাম। তাঁহার নাম এখন মনে নাই। তাঁহার ছোটোভাই জিতেন মুখার্জীকে প্রথমে সেল্‌সম্যান হিসাবে নিযুক্ত করিলাম। তাহার পর আরও দুইজনকে রাখিলাম। প্রচুর অর্ডার আসিতে লাগিল। আমি ট্যাবলেট তৈরি করবার জন্য একটি জার্মান মেশিন ক্রয় করিলাম। ওই মেশিনে বিভিন্ন ডাইস দিয়া চৌকা বড়ি, গোল বড়ি, ছয়কোনা বড়ি প্রস্তুত করিতে লাগিলাম। ভারত বড়ি ছাড়াও অন্যান্য বড়ির নাম রাখিলাম রাজা ও স্বস্তিকা। পঞ্জিকায় বিজ্ঞাপন দিলাম—কাগজ ছিঁড়িবে লেখা থাকিবে। লক্ষ্মীর কৃপা লাভ করিলাম। বাড়িতে ধুম করিয়া লক্ষ্মীপূজা করিতে লাগিলাম। লক্ষ্মীর পাঁচালি পাঠ হইত প্রতি বৃহস্পতিবার। অবন্তীনগরের সেই সওদাগর যেন আমি। বর্মা মুলুক হইতেও কালির অর্ডার পাইলাম। চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল নৌকা যাইতেছে। সেই নৌকায় পেটি ভরতি নবভারত ইন্‌ক কোম্পানির কালির বড়ি। আমিই সেই সওদাগর।

১৪৪টি কালির বড়িতে এক কৌটা। ওইরূপ বারো কৌটায় এক বাক্স। দুইশত বাক্সে এক পেটি। কুড়িটি পেটিতে এক ঠেলা। প্রতি সপ্তাহে এরূপ

দুই ঠেলাগাড়ি মাল খিদিরপুরে পাঠাইতাম। যেবার চীনের সহিত যুদ্ধ হইল, ভারত রক্ষা তহবিলে এক হাজার এক টাকা দান করিলাম। কারখানার শ্রমিক সংখ্যা দশজন হইল। ধুম করিয়া বিশ্বকর্মা পূজা, ওই দিন প্রত্যেক শ্রমিককে মাংস ভাত, এবং দুর্গাপূজায় বোনাস চালু করিলাম। কিন্তু চিরদিন কাহারও সমান নাহি যায়। কালির বড়ির ব্যবহার কমিতে লাগিল। প্রথমে শহরে বিক্রি কমিতে লাগিল, পরে গ্রামেও। কারণ ফাউন্টেন পেন প্রচলিত হইল। ইতিমধ্যে পি. এম. বাক্চি কোম্পানি কালির ব্যবসা উঠাইয়া দেওয়ায় বাজারে কেবলমাত্র আমাদের কালিই ছিল। সে কারণে কিছু কিছু বিক্রয় হইতেছিল। এমতাবস্থায় আমি আমার বড়ো ও মেজ পুত্র কমলচাঁদ ও বিমলচাঁদকে ডাকিয়া বলিলাম—শুনো, গতিক সুবিধার নয়, তোমাদের টাকা দিতেছি, তোমরা অন্য কারবার দেখো।

শোভাবাজারের রসিক সেন লেন-এ একটি প্রেস বহুদিন বন্ধ ছিল। নেতাজী যখন আজাদহিন্দ ফোজ লইয়া ভারতে আসিলেন, তখন ওই প্রেস হইতে কিছু হ্যান্ডবিল ছাপাইয়া বিলি করা হইয়াছিল। আজাদহিন্দ ফৌজের ভারত আগমন তখনও দেশবাসী জানিত না। কোনো কাগজে ছাপা হয় নাই। ব্রিটিশ সরকার ইহা সম্পূর্ণ গোপন রাখিয়াছিল। বাংলায় তখন নিজামুদ্দিনের লিগ সরকার। পুলিশ ওই প্রেস বন্ধ করিয়া দেয় এবং ওই প্রেসের মালিক হরিহর চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করে। পরে খালাস পাইলে হরিহরবাবু প্রেসটি চালাইতে পারেন না। দেশ স্বাধীন হইল, কিন্তু প্রেসটি খুলিল না। আমি ওই প্রেসটি ক্রয় করি। তালা খুলিয়া প্রেসঘরে দেখিলাম অন্ধকার ঘরের কোনায় কয়েকটি কাগজ তখনও পড়িয়া আছে। প্রথমের কয়েকটি লাইন আজও আমার মনে আছে।

হে বীর নেতাজী এসো এসো আজি লয়ে তব বীর সেনানী।
শুধু তোমারেই জানি তোমারেই জানি জানি না বুঝি না জাপানী।
এসো এসো তুমি এ ভারতভূমি চাহিতেছে স্বাধীনতা।
তোজো হিটলার বুঝিনাকো আর বুঝি নেতাজীরই কথা।

শুনেছি বেতারে অতি চুপিসারে নেতাজী পাঠানো বাণী—
মাঠে মাঠে আজ হোক কুচকাওয়াজ দেশের পতাকা আনি।

এই হ্যান্ডবিলটি বাঁধাইয়া রাখিয়াছিলাম প্রেসঘরে। বছর দুই আগে আমি ওই প্রেসে গিয়াছিলাম। ওই ঘরটিতে এখন কমলচাঁদ বসে। অফিসঘর। এয়ারকন্ডিশন বসানো আছে। ওই কবিতাটি দেখিতে চাহিলাম। খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। দেয়ালে নতুন রং। নোটিশবোর্ড, ওই প্রেসেই ছাপা কয়েকটি রঙিন ক্যালেন্ডার, বইয়ের কভার ইত্যাদির নমুনা দেয়ালে লাগানো। কমল বারবার বলিতেছিল আরে, সত্যিই তো, ওটা গেল কোথায়? কিন্তু শেষ পর্যন্ত উহা খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। ওই প্রেসটির প্রাচীন মালিক শ্রীহরিহর চক্রবর্তী নিজেই ওই কবিতাটি লিখিয়াছিলেন। হরিহর চক্রবর্তীর সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল। তিনি নেতাজীর মৃত্যু সংবাদে বিশ্বাস করিতেন না। তিনি দিবারাত্র রেডিওর কাঁটা ঘুরাইতেন এবং রেডিওর সামনে কান দিয়া বসিয়া থাকিতেন। তাঁর ধারণা ছিল পুনরায় নেতাজীর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইবেন। হরিহরবাবুর পক্ষে প্রেসটি চালানো সম্ভব হয় নাই।

হরিহরবাবুর ওই প্রেস হইতেই আমি আমার কালির কৌটার লেবেল ছাপাইতাম, ওই প্রেসের ভার কমলচাঁদকেই দিলাম। একটি ছোটো ট্রেডিল মেশিন মাত্র ছিল। পায়ে চাপ দিয়া চালাইতে হইত। তখন বাগবাজারের যুগান্তর অফিসের ছাদে ঝুলন এবং রাসের সময় কীর্তন হইত। তুষারকান্তি ঘোষ মহাশয় বৈষ্ণব ভাবাপন্ন ছিলেন। আমি একবার আমার স্ত্রীকে নিয়া কীর্তন শুনিতে যাই। নোটিশবোর্ডে দেখিলাম লেখা আছে মেশিন বিক্রয়। আমি সেই মেশিন কমলকে কিনিয়া দিলাম। খুব বড়ো প্লেটের মেশিন। একসঙ্গে অনেক বড়ো ম্যাটার ছাপানো যাইত। ওই প্রেসের পাশের বাড়িটি ছিল একটি লবণের গুদাম। যখন বিলাত হইতে জাহাজ আসিত, তখন খালি আসিলে সমুদ্রের ঢেউয়ে বেশি দুলিবে, সে কারণে লবণ ভরিয়া আনিত। সেই লবণ এখানে বিক্রয় করিত। পরে ওই গুদামটি ভাড়া লইয়া মেশিন বসানো হয়। আজ মা জগদ্ধাত্রীর আশীর্বাদে কমলচাঁদ ভালোই কারবার

করিতেছে। এখন অফসেটে কাজ হইতেছে শুনিয়াছি। অফসেট কি জিনিস আমি ঠিক বুঝি না। কমল পুত্র-কন্যা নিয়া সুখেই আছে।

কমলকে বলি, জ্যেষ্ঠ পুত্র হিসাবে তোমাকেই আমার শ্রাদ্ধশান্তি করিতে হইবে। তোমার সহিত আমার যে জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট আছে, তাহা দিয়াই খরজ করিবে। নিজেরা কোনো টাকা-পয়সা খরজ করিবে না। বেশি ঘটা করা আমার পছন্দ নহে। আমার পিতার শ্রাদ্ধে আমি কোনোরূপ ঘটা করিতে পারি নাই। কতবার ভাবিয়াছি যে টাকাটা আমার পারলৌকিক কাজের জন্য রাখিয়াছি তাহা ইহলোকেই খরজ করিয়া যাই। দুলালের কারবারের অবস্থা ভালো নয়। তাহাকে কিছু দিলে কারবারের সুবিধা হইত। কিন্তু নিজের স্বার্থের দিকেই মানুষের টান। পরলোকে গিয়া সুখে থাকিবার স্বার্থবুদ্ধিতে আমি দুলালকে টাকা দিই নাই। কমল বিমলের জন্য সেরূপ করিতে পারি নাই। কিন্তু উত্তমের ব্রেন ভালো। সে পড়াশোনা করিয়া ইঞ্জিনিয়ার হইয়াছে। বিজনেস লাইনে না গিয়া চাকুরি করিতেছে। সে ভালোই আছে। অবশ্য ইহা আমার ধারণা। আমার ধারণা আমার সেজ পুত্র শিবু খুবই কষ্টে আছে কিন্তু সে সর্বদা গান গাহিতেছে, মুখে সর্বদা হাসি ধরিয়া রাখিয়াছে, কেমন আছ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে ফাস্ক্লাস।

শিবুর কথা পরে বলিব। তার আগে আমি কালির কারবারের কথাটা শেষ করি। আমাদের পরিবারের যেটুকু সহায় সম্পদ দেখিতেছ, যেটুকু মা লক্ষ্মীর কৃপা দেখিতেছ, তাহা মা সরস্বতীর কল্যাণেই হইয়াছে। কালিকে আমি সরস্বতীই বলিব। কালি দ্বারাই তো লেখা পড়া হয়।

পূর্বেই বলিয়াছি ফাউন্টেন পেনের প্রচলন বাড়িতে শুরু করিলে কালির বড়ির বিক্রয় কমিতে থাকে। কিন্তু কীরূপে ফাউন্টেন পেনের কালি করিতে হয় তাহা আমি জানিতাম না। কালির বড়ি জলে গুলিয়া ফাউন্টেন পেনে ভরা যায় না। নিব বন্ধ হইয়া যায়। একজন কেমিস্ট আনাইয়া ফাউন্টেন পেনের কালি কীরূপে প্রস্তুত হয় তাহা জানিলাম। দেখিলাম অনেক ঝামেলা। ঝামেলা পোষাইবে না। তখন এক বুদ্ধি করিলাম। আমি লক্ষ

করিয়াছিলাম লিপিস্টিকের ব্যবহার দিনে দিনে বাড়িতেছে। ঘরে ঘরে লিপিস্টিক ঢুকিতেছে। বউ-ঝিরা সাজিবার জন্য স্নো-পাউডারই ব্যবহার করিত। ঠোঁট রাঙাইবার জন্য পান খাইত। কিন্তু লিপিস্টিক প্রচলন শুরু হইবার পর আমার মনে হইল দেখি, একটা বুদ্ধি করিয়া কারবারটিকে যদি আরও কিছুদিন বাঁচানো যায়। আমি একটি নতুন ডাইস করাইলাম। ডাইস্‌টি লিপিস্টিকের মতোই। কালির গোল বড়ির বদলে লিপিস্টিকের ন্যায় লম্বা লম্বা লাল কালির স্টিক তৈয়ারি হইল। ডেকস্‌ট্রিনের সহিত যখন রং মাখা হইত, তখন একটু সেন্ট মিশাইয়া দিতাম। আর্টিস্ট দিয়া একটি ছবি আঁকাইয়া ছিলাম। এক সুন্দরী নারীর ঠোঁট দুটি লাল টুকটুক করিতেছে। সে হাতে ধরিয়াছে আমাদের এই স্টিক কালি। কালির নাম দিয়াছিলাম রূপসী। একবারও বলি নাই ইহা লিপিস্টিক। এক বাক্সে ১৪৪টি, বা এক গ্রোস মাল থাকিত। বাক্সের গায়েও ওই রূপসীর ছবি। তখন সবচেয়ে সস্তার লিপিস্টিকের দাম ছিল কমপক্ষে দেড়টাকা। আর আমার রূপসী স্টিকের খুচরা বিক্রয়মূল্য ছিল পনেরো নয়া পয়সা মাত্র। ওই রূপসী কালি ভালোই বিক্রয় হইতে লাগিল। আমার সেলস্‌ম্যানগণ বিহার, আসাম, ত্রিপুরা হইতে অর্ডার আনিতে লাগিল। আসামের খাসিয়া মেয়েদের কাছে এই কালি খুব প্রিয় হইয়া উঠিল।

ওই একই ডাইসে লাল রং-এর পরিবর্তে কালো রং দিয়া কালো স্টিক কালিও তৈয়ার হইত। উহার ইংরেজি নাম দিলাম অ্যাড্রেস। ওই স্টিক কালি জলে ডুবাইয়া কাঠের বাক্সের গায়ে ঠিকানা লেখা চলিত, চটের বস্তার গায়ে নম্বর দেয়া চলিত। দেখো, একই ফরমুলার কালি, লাল কালি জলে ডুবাইয়া গরিব মেয়েরা তাহাদের ঠোঁটে সুন্দরের ঠিকানা লিখিতেছে, আবার কালো কালি জলে ডুবাইয়া পেটির গায়ে ঠিকানা লেখা হইতেছে।

এইবার একটি ঘটনার কথা বলি। আমার নাতি নাতনিগণের ঠাকুরমার কথা এতক্ষণে কিছুই বলি নাই। তিনি তো চিরকাল বুড়ি ছিলেন না, এক সময়ে যুবতী ছিলেন, তাঁহারও সাজিতে ইচ্ছা করিত। ২৫শে বৈশাখ ছিল

আমাদের বিবাহের তারিখ। আমার বিবাহের সময় ২৫শে বৈশাখের ঘটা হইত না। যখন বিবাহ করিয়াছিলাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঁচিয়াছিলেন। যাহা হউক, যখন পঁচিশে বৈশাখের উৎসব হইত, আমরা বলিতাম—আমাদের বিবাহ বার্ষিকীর উৎসব হইতেছে। এইরূপ এক পঁচিশে বৈশাখের দিনে কমলের মা আমাকে প্রণাম করিয়া মিটিমিটি হাসিতেছে। দেখিলাম তাঁর ঠোঁট দুটি লালচে পানা। ইহাতো পানের লাল নয়। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম কিগো, লিপিস্টিক কোথায় পেলে? সে হাসিয়া কহিল কেন, তোমার কোম্পানির লিপিস্টিক। আমি বলিলাম সে কী, এই জিনিস দিয়েছ কেন, এই কালি মুখে চলে যাবে না? কী রং তার ঠিক নেই কো। সে তখন বলিল—বিক্রি তো করছ। কত মেয়েরা এটা লাগাচ্ছে। কুমুদিনীর ওই কথা শুনিয়া আমার মনে হইল—আমি কি ঠিক করিতেছি? ওই রং ঠোঁটের মতো নরম স্থানে লাগাইবার উপযুক্ত কিনা, তাহা কি কোনোদিন পরীক্ষা করিয়াছি? পরদিন কুমুদিনীর দাস্ত হইল। আমার ধারণা হইল ওই কালি পেটে গিয়াই দাস্ত হইয়াছে। তখন মনে হইল যাহা করিয়াছি ঠিক করি নাই। এরূপ আর করিব না। আমি লেবেলের লাল ঠোঁটের মেয়ের ছবি ছাপা বন্ধ করিয়া দিলাম। ইহা পড়িয়া তোমরা আমার উদ্দেশ্যে একবার সাধুবাদ দাও। দেখো, পয়সা রোজগার করিয়াছি সত্য। কিন্তু বিবেক জলাঞ্জলি দিই নাই।

লেবেল ছাপা বন্ধ করিলাম সত্যকথা। কিন্তু লাল স্টিক কালি তৈয়ারি বন্ধ করি নাই। ভাবিয়াছিলাম খরচ করিয়া যখন ডাইস তৈয়ারি করিয়াছি তখন ওই জিনিসটা থাকুক, রূপসী নাম পালটাইয়া করিলাম অ্যাড্রেস রেড। অথচ প্রায় আগের মতই বিক্রয় হইতে লাগিল। সেল্সম্যানরা বলিল—মার্কেট ধরিয়া গিয়াছে। আমি লেবেলে নট ফর কসমেটিক ইউজ লিখিয়া দিলাম।

শিমুলতলা গিয়াছিলাম। এক বাঙালি ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ হইল। একথা সেকথার পর তিনি বলিলেন ওই অঞ্চলে ঠোঁটের ক্যান্সারের রোগিণী পাইতেছেন। সম্ভবত, বস্তায় নম্বর লিখিবার কালি ঠোঁটে লাগাইয়া গরিব মেয়েরা এই রোগ বাঁধাইতেছে।

আইনত আমি দোষী নহি। আমি কখনও লেবেলে লিখি নাই ইহা লিপিস্টিক। তথাপি মনে হইল আমার পাপ হইয়াছে। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত কীরূপে হইবে আমি জানি না। তবে আমার ওই পাপের ফলেই কি শিবুর নিকট হইতে অশান্তি পাইতেছি? যাহা হউক আমি স্থির করিলাম যে লাল রং-এর স্টিক কালি আর তৈয়ার করিব না। দেখো ভালো কাজ করিলে ভগবানও কীরূপ খুশি হন। আমি প্রোডাকশন বন্ধ করিয়া দিবার কয়েকদিন পর স্বপ্ন দেখিলাম যে আমি শিমুলতলায় বেড়াইতে গিয়াছি, একটি সিংহ মাঠে ছাগলছানার ন্যায় লাফালাফি করিতেছে। সিংহের গলায় মেডেল দেখিয়া বুঝিলাম উহা আমাদের জগদ্ধাত্রীর সিংহ। তবে কি মা শিমুলতলায় আসিয়াছেন? তৎক্ষণাৎ দেখিলাম মা জগদ্ধাত্রী আমার ঘরের বেতের চেয়ারে বসিয়া আছেন। আমি ভূমিতে পড়িয়া প্রণাম করিলাম। তারপর উঠিয়া দেখি, মা অদৃশ্য হইয়াছেন। আমার বিশ্বাস হইল মা আমার সহায় আছেন। রূপসী স্টিক কালি বেচিয়া অনেক টাকা করিয়াছি সত্য, কিন্তু আর বেচিব না। আমার সেল্‌সম্যানরা রাগ করিল। বলিল এটা ঠিক করলেন না সত্যবাবু, আমাদের কমিশন কমে যাবে। আমাদের তো সংসার আছে। আমি বলিলাম—না পোষায় এই কোম্পানি ছাড়িয়া দিন। দুইজন পুরাতন সেল্‌সম্যান কোম্পানি ছাড়িয়া দিল। ইতিমধ্যে ডটপেনের প্রচলন হইয়াছে। সবার পকেটেই ডটপেন। স্থির করিলাম এই কারবার বন্ধ করিয়া দিতে হবে। আমার পিতা কত কষ্ট করিয়াই না এই কারবার পত্তন করিয়াছিলেন। পিতার স্মৃতিচিহ্ন ছিল দুইখানি কাঠের মুগুর। ৪৬ সনের দাঙ্গায় খোকা, জগাদের দ্বারা মানুষের রক্তে ওই মুগুর কলুষিত হইলে আমি গঙ্গায় বিসর্জন দিয়াছিলাম। গঙ্গা উহা সমুদ্রে নিয়া গিয়াছে। বিশাল সমুদ্রের মধ্যের কোনো স্থানে এখনও হয়তো স্বদেশী কালি তৈয়ারির প্রচেষ্টার আদিম যন্ত্র দুইটি একাকী ভাসিতেছে।

আমার মেজপুত্র বিমল তখন কেবল বডি বিল্ডিং করিতেছে। শোভাবাজারে ছিল বিপ্লবীদের প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি ব্যায়ামের আখড়া। কুস্তি, লাঠিখেলা, বারবেল, ডাম্বেল প্রভৃতির চর্চা হইত। বিমল শোভাবাজার

ব্যায়াম সমিতিতে দুইবেলা একসাইজ করে, ছোলা-গুড় খায়, জল-ছাতু খায়। ম্যাট্রিকে দুইবার ফেল করিয়াছে। বিমলকে একদিন ডাকিয়া বলিলাম কত দিন আর বাপের হোটেলে খাবি, কাজ কারবার কিছু দেখ। আমি এইবার কালির কারবার উঠাইয়া দিব। মনে হইল বিমলের ফুলানো বাইসেপটি চিমসাইয়া গিয়াছে। সে যেন জলে পড়িল। মনোহর আইচের চেলা হইয়াছে সে। তা ছাড়া, সে তখন সেলুনে গিয়া ঘাড়ে গোল ছাঁট করিতেছে। কপালের ওপর চুলের চূড়া। সে বোধহয় স্থির করিতে পারিতেছিল না ভারতশ্রী হইবে, নাকি উত্তরকুমার হইবে। বিমল, ইহা পড়িয়া তুমি রাগ করিও না। তুমি একবার সেই সময়ের কথা ভাবো। তোমার শার্টের পকেটে কি সর্বদা চিরুনি থাকিত না? তুমি ঘনঘন ছাদে উঠিতে না? রামাপতিবাবুর কন্যাও চুল শুকাইবার ছল করিয়া ঘনঘন ছাদে উঠিত। তুমি পাঁউরুটির ঠোঙার ভিতরে যে চিঠি ছুঁড়িয়া দিয়াছিলে তাহা পড়বি তো পড়, আমার সম্মুখেই পড়িল। রাস্তায়। আমি তোমাকে একটি মোক্ষম থাপ্পড় মারিয়াছিলাম। এখন বুঝিবে, আমি ভালোই করিয়াছিলাম। আমি রমাপতিবাবুকে বলিলাম আপনার কন্যার ছাতে উঠা বন্ধ করুন।

যাহা হউক, আমি বিমলকে বলিলাম তুমি ন্যাপথালিনের কারবার করো। আমি নতুন ডাইস তৈয়ারি করাইলাম। গোল গোল। বাজার হইতে ন্যাপথার গুঁড়া কিনিয়া আনিয়া মেশিনে দিলে ন্যাপথালিনের বল বাহির হইবে। জল দিয়া মেশিন ধৌত করিলাম। নতুন ডাইস হওয়া সত্ত্বেও প্রথমে বেশ কিছুদিন ন্যাপথালিনের গায়ে রং-এর ছোপ থাকিত। মেশিনের নালীপথে বহুদিনের সঞ্চিত স্মৃতি লাগিয়া ছিল। স্মৃতি সহজে মুছে না। বিমল ক্রমশ কাজে লাগিল। তাহার কারবার উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল।

একদিন আমার স্ত্রী আমাকে বলিল যে সে একটা স্বপ্ন দেখিয়াছে। সে বর্ণনা করিল—আমরা দুইজনে যেন একটি গর্তে পড়িয়া গিয়াছি, কিছুতেই গর্তটি হইতে উঠিতে পারিতেছি না, এমন সময় উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর একটি দড়ি ফেলিয়া দিলেন। ওই দড়িতে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে লেখা আছে। ওই দড়ি ধরিয়া আমরা উঠিয়া আসিলাম। এইরূপে উদ্ধারণ

ঠাকুর আমাদের উদ্ধারের পথ দেখাইলেন। ওই স্বপ্নের বর্ণনা শুনিয়া আমিও খুব আশ্চর্য বোধ করিলাম। কারণ আমিও একটি স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম— যাহার অর্থ তখন বুঝি নাই। কুমুদিনীর ওই স্বপ্নটির বর্ণনা শুনিয়া আমার দেখা স্বপ্নটির অর্থ বুঝিলাম। আমি স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম আমি বিছানায় শুইয়া আছি, কে যেন ডাকিতেছে, সত্য, এদিকে আয়, সত্য এদিকে আয়... কিন্তু আমি কিছুতেই উঠিতে পারিতেছি না। অনেক চেষ্টা করিলাম, তথাপি বিছানা হইতে উঠিতে পারিলাম না। বুঝিলাম সংসারের আঠায় আটকাইয়া গিয়াছি। চিটেগুড়ে পড়লে মাছি নড়তে-চড়তে পারে না। আমি এখন এই সংসারের চিটেগুড়ে মাছি হইয়া রহিয়াছি। অথচ ডাক আসিয়াছে। কে ডাকিতেছেন? বুঝিলাম আমাদের উদ্ধারণ ঠাকুর।

নাতি-নাতনিগণ, তোমরা উদ্ধারণ ঠাকুরের সম্পর্কে কিছুই জান না গো। তোমাদিগের ঘরে ক্রিকেট খেলোয়াড়ের ছবি শোভা পায়, বাইস্কোপের হিরো হিরোইনদিগের ছবি শোভা পায় কিন্তু আমাদের উদ্ধারণ দত্তকে চেন না। ঠাকুরঘরে শ্রীশ্রীউদ্ধারণ ঠাকুরের ছবি আছে। তিনি আমাদের সুবর্ণবণিক বংশের গৌরব। দত্তঠাকুর ছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা সহচর। কাটোয়ার কাছে উদ্ধারণপুর তাঁরই নামে। দত্তঠাকুরের ব্যবসাপাতি ছিল, অনেক টাকা-পয়সাও রোজগার করিয়াছিলেন। কিন্তু সব টাকা-পয়সা অকাতরে দেবদ্বিজ বৈষ্ণব সেবায় খরচ করিয়াছিলেন। আদিসপ্তগ্রামে দত্তঠাকুরের হাতে গড়া মন্দির আছে। আমাদের দত্তঠাকুরের জীবনের একটি কাহিনি বলি শুনো। নিত্যানন্দ ঠাকুরের বে শাদি হল। তাহার পর সপ্তগ্রামের দত্তঠাকুরের বাড়িতে নিত্যানন্দের বিবাহের ভোজ উৎসব চলিতেছে। নিত্যানন্দ নিজেই রন্ধন করিতেছেন, দত্তঠাকুর তাহাকে সাহায্য করিতেছেন। ইহাতে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। কারণ বল্লালসেন সুবর্ণবণিকদের নিকট হইতে ইচ্ছামতো টাকা না পাইয়া সুবর্ণবণিকদের শূদ্র করিয়া দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণরা শূদ্রের হাতের ছোঁয়া খাইবে না বলিলেন। একথা শ্রীনিত্যানন্দ জানিতে পারিলেন। উদ্ধারণ দত্ত তখন একটি অড়হড় কাঠি দ্বারা ডাল নাড়িতেছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ

দত্তঠাকুরের মহিমা দেখাইবার জন্য দত্তঠাকুরকে আদেশ দিলেন এই অড়হড়ের ডালটি পুঁতিয়া দাও। দত্তঠাকুর তাহাই করিলেন, আর সেই কাঠিটি মাটিতে পুঁতিবামাত্র তাহা হইতে পাতা বাহির হইল এবং দেখিতে দেখিতে উহা একটি বড়ো মাধবীতরুতে পরিণত হইল। তাহাতে বহু শাখাপ্রশাখাও দেখা দিল। ব্রাহ্মণরা তাজ্জব বনিয়া গেলেন। শেষ কালে ওই মাধবীর ছায়াতেই ব্রাহ্মণরা খাওয়া দাওয়া সারলেন। ওই মাধবীকুঞ্জ শ্রীপাটে এখনও বর্তমান আছে।

বিমলের জন্য যখন মেয়ে ঠিক করলুম, তখন ওই মাধবীকুঞ্জতেই আমরা ব্যবস্থা করেছিলুম। সে কথা পরে লিখিবখনে। আবার সেই স্বপ্নের কথায় আসি। দত্তঠাকুর যখন স্বপ্নে পৃথকভাবে আমাদের দুইজনকে আহ্বান করিলেন, আমরা ঠিক করিলাম দুইজনেই কৃষ্ণমন্ত্র লইব। আমাদের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কেহ কেহ কৃষ্ণমন্ত্রী আছেন, কিন্তু আমাদের বংশে ইতিপূর্বে কেহই পূর্বে কৃষ্ণমন্ত্র নেন নাই। আমাদের আরাধ্যা দেবী সিংহবাহিনী, অর্থাৎ জগদ্ধাত্রী। যদিও আমাদের পরিবারের পূজায় পশুবলি হয় না। চালকুমড়া ও শশা বলি হয়—মহিষ ও পাঁঠার প্রতীক। যাহা হউক, যে কোনো কার্য করিতে গেলে যে রূপ মায়ের অনুমতি লইতে হয়, সে রূপ আমিও মাতা জগদ্ধাত্রীকে বলিলাম মাগো, উদ্ধবঠাকুর স্বপন দেখিয়েছেন, কৃষ্ণ মন্তর নিয়ে আসি। অনুমতি করো। উদ্ধবঠাকুরের সাক্ষাৎ শিষ্যবংশের মথুরা গোঁসাইয়ের নিকট হইতে দীক্ষা লইয়া নিজেকে কৃষ্ণে সমর্পণ করিলাম। সস্ত্রীক নবদ্বীপ গিয়া কিছুদিন থাকিলাম, তারপর মথুরা ও ব্রজধামে গেলাম। ব্রজধাম বড়ো ভালো লাগিল। ব্রজধামে অনেক হনুমান দেখা যায়। একবার একটি হনুমান আমার ব্যাগটি কাড়িয়া লইল। ব্যাগের মধ্যে একটি বিস্কুটের প্যাকেট ছিল। উহা গ্রহণ করিল, কিন্তু মানিব্যাগটি অবজ্ঞায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া গাছের ডালে পরমানন্দে দোল খাইতে লাগিল। আমিও তখন ভাবিলাম টাকা পয়সার মায়া পরিত্যাগ করিতে না পারিলে কৃষ্ণ-বৃক্ষের শাখে দোল খাওয়া যায় না। আমরা দুইজনে মিলিয়া স্থির করিলাম কিছু টাকা নিজেদের জন্য রাখিয়া বাকি টাকা পুত্রকন্যাদের

ভাগ করিয়া দিব। উহারা যেমন পারে সংসার চালাক, কারবার করুক, আমরা তীর্থ করিব, সংসারের কাদা জলে আর হাবুডুবু খাইব না। ইতিমধ্যে কমলকে প্রেস ও বিমলকে ন্যাপথলির কারবার করিয়া দিয়াছি। শিবু, দুলাল, উত্তম, তোমরা আমাকে ভুল বুঝিও না। তোমাদের আমি কারবার ধরাইয়া দিতে পারি নাই, কমল ও বিমলকে যেরূপ ধরাইয়া দিয়াছিলাম। তোমাদের জন্য বেশি টাকাও ছিল না। কারণ ইতিমধ্যে নাথের বাগানে ভদ্রাসন করিয়াছি, সল্টলেকেও বাড়ি করিয়াছি। তোমাদের ভগিনীর বিবাহ দিয়াছি, আমার নিকট আর বিশেষ টাকা ছিল না। সে কারণে তোমাদের বেশি টাকা দিতে পারি নাই। কিন্তু আমার দুঃখ রহিয়া গেল, শিবু ওই টাকা উড়াইয়া দিল। আমি জানি বিজনেস ফেল হয়, কিন্তু শিবু, তোমার বিজনেস করিবার চেষ্টা নাই। চানাচুরের ব্যবসাও ভালো ব্যবসা। এই ব্যবসাটিও মন দিয়া করিলে না। মদ্যপ দিগকে চানাচুর বিতরণ করিলে। ব্যবসার সামগ্রী বিতরণ করিতে নাই। বিক্রয় করিতে হয়। কেন তুমি রেস খেলিতে গেলে? তুমি গাড়ির দালালি করিলে, জমির দালালি করিলে, বাড়ির সামনে আসিয়া লোকে তোমায় চিটিংবাজ বলিয়া গাল দিল। ইহা শুনিবার পূর্বে আমার বধির হওয়া ভালো ছিল। তুমি মদ্যপ হইয়া টলিতে টলিতে ঘরে আস, একদিন দেখিলাম তোমার ঠোঁট হইতে রক্তপাত হইতেছে। উহা দেখিবার পূর্বে আমার অন্ধ হইয়া যাওয়া ভালো ছিল। কিন্তু আমার এইসব দেখিতে হইতেছে! আবার যখন ইহাও দেখি ২৩শে জানুয়ারি নেতাজীর জন্মদিবসের দিন আমার শিবু অর্ডার দিয়া ঝুড়ি ভরা জিলাপি আনিয়া শুধু এই বাড়ির সকলকেই নয়, পাড়া প্রতিবেশি এবং বস্তির শিশুদের মধ্যে বিতরণ করে—শিশুরা সব শিবুর সহিত গলা মিলাইয়া বলে জয়তু নেতাজী, নেতাজী ফিরে এসো, তখন চোখ সার্থক মনে হয়। আবার দুলালের পাগল বৌটিকেও দেখিতেছি, দেখিয়া আমার দুঃখের অবধি থাকে না। একদিন দুলালের বৌ আমার কাছে আসিয়া বলিল বাবা, আমার বাচ্চা হবে না? আমি কোলে ছেলে নিয়ে কবে দুধ খাওয়াব বাবা, আপনার ছেলে আমায় বাচ্চা দিচ্ছে না, কেন দিচ্ছে না?

আমি তখন কী বলিব? সবই হরির ইচ্ছা বলিয়া অন্যদিকে মুখ ঘুরাইয়া থাকিলেও যে চোখে জল আসে। একদিন দেখিলাম আমার গোপালকে বৌমা বলিতেছে আয় না ছেলে হয়ে, আয় না আমার পেটে, তোকে ঝুঁটি বেঁধে দেব, ঝুঁটিতে ময়ূর পেখম গুঁজে দেব, আইসকিরিম খাওয়াব, মাইরি বলছি, কাপের আইসকিরিম। ক্যাডবেরি খাবি নাড়ুগোপাল, ক্যাডবেরি খাবি? আমার স্ত্রী জীবিত থাকিয়া এইসব দেখিলে খুবই দুঃখ পাইতেন। তিনি সৌভাগ্যবতী, গত হইয়াছেন, কিন্তু আমাকে এইসব দেখিতে হইতেছে। কী করিব। আমি একদিন দুলালকে ডাকিয়া আনিলাম। দুলালের মায়ের পক্ষে এরূপ কথা বলা সহজ, কিন্তু আমার পক্ষে কত কঠিন, তথাপি, দুলালকে বলিলাম দুলাল, বৌমার কোলে একটি সন্তান দরকার। ছেলে পিলে হলে, ভালো হয়ে যাবে। দুলাল আমার দিকে বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, আমার আরও সর্বনাশ করতে চাও, কী ক্ষতি করেছি আমি? বলিয়াই চুপ করিল। মনে আছে ঠিক এই কথাটি শেষ হইবার পরই একটি দমকলের গাড়ি ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে কোথাও আগুন নিভাইতে গেল। দুলাল চুপ। ক্রমশ ঘণ্টাধ্বনি ম্রিয়মান হইলে দুলাল মাথা নিচু করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, ডাক্তার বলেছে বাচ্চা হলে বাচ্চার পাগল হবার চান্স আছে।

আমার পুত্র কন্যাদের মধ্যে একমাত্র কুটুই ভাব ভালোবাসা করিয়া বিবাহ করিয়াছে। অন্য সব পুত্রকন্যাদের আমিই বিবাহ দিয়াছি। কিন্তু নাতি নাতনিদের যে রূপ হাবভাব দেখিতেছি মনে হয় না উহারা গার্জেনের মত লইয়া বিবাহ করিবে। এবার পুত্রকন্যাদের বিবাহের বিষয়ে কিছু লিখিব। কমলের বিবাহ হয় শীতকালে। গোরাচাঁদবাবুর বড়ো ইচ্ছা ছিল আমার কাকার ছেলে নেপুর সহিত মেয়ের বিবাহ দিবেন। তখন নেপু ম্যাট্রিক পাস করিয়া জনসন অ্যান্ড জনসন কোম্পানিতে কাজ করিতেছিল। কিন্তু কাকার ইচ্ছা ছিল দুধে-আলতা রং-এর বৌ আনিবেন। গোরাচাঁদবাবুর কন্যার রং ততটা ফর্সা ছিল না। আমার কাকার খুবই ফর্সা-ফর্সা বাতিক। আমার কাকিমা খুবই ফর্সা ছিলেন। এবং স্বাস্থ্যবতী ছিলেন। শুনিয়াছি, আমার কাকার নির্দেশে কাকিমাকে পশ্চাতদেশ আলতায় রঞ্জিত করিয়া পাতলা শাড়ি পরিতে হইত। কাকা গরজ করিলেন না, কিন্তু আমি গোরাচাঁদবাবুকে

বড়ো শ্রদ্ধা করিতাম। বড়াল বংশের মানুষ। কবি অক্ষয়চন্দ্র বড়াল ছিলেন ওই বংশেরই মানুষ। সাধারণত কন্যার পিতাই প্রথমে প্রস্তাব করে। কিন্তু আমি নিজেই গোরাচাঁদবাবুকে গিয়া বলিলাম নেপুর সঙ্গে যদি না হয়, তবে আমার ছেলের সঙ্গে কী হতে পারে? উনি বললেন তা তো উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু জানেন তো আমার মেয়ে কিন্তু শ্যামলা, আর খুব যে দেয়া নেয়া করতে পারব এমন সামর্থ্য নেই। আমি তাহার মুখের কথা কাড়িয়া মুক্তকণ্ঠে কহিলাম ডাল ভাত মোটা কাপড় আমার জুটে যাচ্ছে। আমি কিছুই চাই না। অতঃপর বিবাহ হইল। ভেটকির সড়সড়ির কথা অনেকেই বহুদিন পর্যন্ত বলিয়াছিল। পাতা ক্ষীর করিয়াছিলাম। জনাই হইতে মনোহরা ও কৃষ্ণনগর হইতে সরপুরিয়া আনাইয়াছিলাম। ইহা ছাড়া নকুড়চন্দ্রের সন্দেশ ও পান্তোয়া ছিল। যাহা হউক, প্রথম পুত্রের বিবাহে যথেষ্ট আমোদ আহ্লাদ হইয়াছিল। মানিলকলাল দে মহাশয় বিবাহের দিন সকালে আসিয়া তার সুললিত কণ্ঠে গান শুনাইয়াছিলেন। গোরাচাঁদবাবুও সাধ্যমতো খরচ করিয়াছিলেন। খাট, আলমারি, দেরাজ ছাড়াও একটি বড়ো মারফি রেডিও এবং একটি গ্রামোফোন দিয়াছিলেন। কমলের ঘর হইতে কৃষ্ণচন্দ্র দে-র গান, কাননবালা, আঙুরবালা, কমলা ঝরিয়া, সত্য চৌধুরী, হেমন্তবাবুদের গান ভাসিয়া আসিত। তখন গ্রামোফোন কোম্পানি বিজ্ঞাপন দিত। সুখী গৃহকোণ শোভে গ্রামোফোন। কমল-উষাকে দেখিয়া সত্যই মনে হইত তাঁহারা সুখী। ঈশ্বর যেন তাঁহাদের সুখে রাখেন।

বিমলের বিবাহ হইয়াছিল আকস্মিক ভাবে আমি ও কমল-বিমলের মা কাশি মিত্তিরের ঘাটে গ্রহণের স্নান সারিয়া ফিরিতেছিলাম, দেখি একটি মেয়ে আছাড়ি পিছাড়ি খাইতেছে। কাঁদিয়া চক্ষু ফুলিয়া গিয়াছে। ঘাটের পাথরে মাথা ঠুকিতেছে, আর বলিতেছে মাগো, কেন তুমি গলায় দড়ি দিলে মা। কয়েকজন ব্যাটাছেলে তাহাকে বলিতেছে কেঁদে আর কী হবে, মা কি ফিরবে? নে, নাভি ভাসিয়ে ডুব দিয়ে আয়। মেয়েটি চিৎকারে বলিতেছে তোমরা মাকে ফিরিয়ে দাও। নইলে আমিও গঙ্গায় ডুবে মরব। এই বলিয়া সিঁড়ির ধাপ অতিক্রম করিয়া গঙ্গাভিমুখে চলিল।

কুমুদিনী গিয়া মেয়েটিকে ধরিল। বলিল, বাছা, অমন করছ কেন। মেয়েটি বলিল আমার মাকে এনে দাও।

কুমুদিনী বলিল আমিই তোমার মা। ইহা শুনিয়া মেয়েটি কুমুদিনীকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। আমারও চোখ বাস্ট করিয়া জল আসিল।

জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে বৌটি গলায় দড়ি দিয়াছে, সে দিন সাতেক পূর্বে একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়াছে। ইহার পূর্বেও তার পাঁচটি কন্যা সন্তান হইয়াছিল। তাঁহার শ্বাশুড়ি, ননদ সবাই গঞ্জনা দিত। এইবার সে তারকেশ্বরে ধন্যা দিয়াছিল। সে নাকি স্বপন পাইয়াছিল পুত্র হইবে। কিন্তু কন্যাই হইল। কন্যা হওয়াতে নিজের প্রাণ নিজে দিল। তাহার স্বামী মিলিটারিতে চাকুরি করে। তখনও আসিয়া পৌছিতে পারে নাই। যে মেয়েটি পাথরে মাথা কুটিতেছিল, সেই বড়ো মেয়ে। মায়ের মুখাগ্নি করিয়াছে। মেয়েটির গায়ের রং স্বর্ণচাঁপার মতো। মুখটি যেন খোদাই করা। চুল যেন মা জগদ্ধাত্রীর ঘরের চামর। বাড়ি ফড়িয়াপুকুর। আমাদেরই জাতের। পদবী ধর। ওদের ঠিকানা নিয়া আসিলাম।

বাড়ি আসিলে কুমুদিনী বলিল—মেয়েটিকে যখন বলেছি আমাকেই মা ডাকিস, আমি ওকেই বৌ করে আনব তুমি আপিত্তি কোরো না। আমি বলিলাম তোমার যদি পছন্দ হইয়াছে তো হু অ্যাম আই? কিন্তু ভাবিয়া দেখো বিমলের কতগুলি শালী হইবে। বিমলকেই সব দায়িত্ব লইতে হইবে।

কুমুদিনী বলিল তা হোক গে। মায়ের কৃপায় তা হয়ে যাবে। ভাবিলাম বিমলকে মেয়ে দেখানো কর্তব্য। আদি সপ্তগ্রামের মাধবীকুঞ্জে চারি চোখের মিলন করাইলাম। আজকাল ভিক্টোরিয়া রানীর বাগানে এইসব চল হইয়াছে, কিন্তু আমি কত পূর্বে এরূপ করিয়াছি। পছন্দ যে হইবে তাহা জানিতাম। ইতিমধ্যে ওই নবজাত কন্যা শিশুটির মৃত্যু হইয়াছিল। মা মরলে এই টুকুন বাচ্চা কি বাঁচে? সে কারণে বিবাহ হইতে কিছু বিলম্ব ঘটিল।

যে বৎসর জোড়াবলদ চিহ্নধারী অশোক সেনকে হারাইয়া কাস্তে ধানের শিষ চিহ্নধারী মোহিত মৈত্র এম.পি. হইলেন, সেই বৎসরই বিমলের বিবাহ হইল। উহার কিছুকাল পূর্বে নয়া পয়সার প্রচলন হইয়াছে, সেরের বদলে

কিলো হইয়াছে। ওই বৌভাতে তিরিশ সের নহে, তিরিশ কিলো গলদা চিংড়ি আনিয়া মালাইকারি করা হইয়াছিল। মেয়েটির নাম ছিল বিমলা। দেখ, নামের কি মিল। বিমলের জন্যই যেন ঈশ্বর এই মেয়ে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু কুমুদিনী বলিল নামটা যেন আমাদের কালের। আমি নাম পাল্টাইয়া রাখিলাম বিউটি। সে সময় কেহ এরূপ নাম রাখে নাই। আমি দেখিলাম বাস্তবিক মেয়েটি বিউটিফুল। তাই বিউটি রাখিলাম। বিউটির অন্য বোনদেরও সুপাত্রে বিবাহ দেয়া হইয়াছে। চতুর্থ ভগিনীর নাম ছিল আন্না, পঞ্চম ভগিনীর নাম ছিল ঘেন্না। আমি নাম পরিবর্তন করিয়া চামেলি ও শিউলি করিয়াছিলাম। মেজ বৌমা বিউটি আমার অনেক যত্ন করে। ঈশ্বর তাহাকে সুখে রাখুন। জীবনে এই কাজটি অন্তত ভালো করিয়াছি। পুণ্যের কাজ করিয়াছি। তথাপি বিধাতা আমাকে এরূপ শাস্তি দিলেন? একদিন থানা হইতে খবর দিল শিবুকে পুলিশে ধরিয়া বড়তলা থানায় রাখিয়াছে। শিবুকে একটি বারবনিতার গৃহ হইতে গ্রেফতার করা হইয়াছে।

শিবুকে বলিয়াছিলাম বয়স হইয়াছে, তোমার জন্য কন্যা দেখি। কিন্তু কন্যার বাপ যখন জিজ্ঞাসা করিবে পাত্র কী করে তখন আমি কী বলিব?

শিবু জবাব দিয়েছিল বলে দিও বাপের হোটেলে খাচ্ছে। আমি বলি দেখ শিবু বাপের হোটেল একদিন তো বন্ধ হইবে। শিবু বলে তবে দাদাদের বলে প্রেসের কারবার কিংবা ন্যাপথলির কারবারের শেয়ার করিয়ে দাও। কিন্তু কমল বিমল রাজি হইল না, আমিও আর জোর করিলাম না। আর শিবুও বোমভোলা হইয়া ঘুরিতে লাগিল, শিবুর বিবাহের জন্য আর চেষ্টা করিলাম না।

এবার রেখার বিবাহ প্রসঙ্গে আসি। এ মেয়ে আমার বড়ো আদরের। আমি ঠিক করিয়াছিলাম রেখাকে যেমন তেমন ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিব না। বহু সম্বন্ধ আসিত। লোকে ভাবিত একমাত্র মেয়ে, খুব দেয়া নেয়া করিবে। যুগল দে মহাশয়ের সহিত কথা বলিয়া মনে হইল আমি কী দিব থুইব সে সম্পর্কে তিনি উদাসীন। এ বিষয়ে কোনো কথাই কহিলেন না। ঠিক করিলাম যুগলবাবুর পুত্রর সঙ্গেই রেখার বিবাহ দিব। বাবাজীবন বি. কম.

পাস করিয়া কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট হইয়া টাটার কোম্পানিতে কার্য করিতেছিল। দেখিতেও যেন কার্তিক। যুগলবাবুর ছিল কাচের কারবার। রেখার যে দিন বিবাহ হইল সেই দিন আমাদের রাস্তায় লাল আলোর মালা। রাস্তার লাইট লাল কাগজে মোড়াইয়া দিয়াছিল—তখনও সেইরূপ আছে। যাহারা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন তাহারা বলিয়াছিলেন, করেছেন কি সত্যবাবু, মেয়ের বিয়েতে সারা পাড়াটা আলোয় সাজিয়েছেন? আসলে রেখার বিবাহের কয়েকদিন আগেই ভোট হইয়াছিল। ভোটে প্রফুল্ল সেনের কংগ্রেস হারিয়া গিয়েছিল। অজয় মুখার্জী মুখ্যমন্ত্রী, জ্যোতি বসু উপ-মুখ্যমন্ত্রী। আমার কালির কলের যে লাল কালি দিয়া ডাল্টনগঞ্জ-হাতিয়া-দুমকা কিংবা শিলং-কোহিমা-মণিপুরের মেয়েরা ঠোঁট লাল করে, সেই কালি দিয়া আমাদের কালির কলের কর্মচারীরা গোপনে পোস্টার লিখিয়াছিল দুনিয়ার মজদুর এক হও—কাস্তে হাতুড়িতে ভোট দাও।

ইহার কিছুদিন পরে আমার কারখানার দেয়ালেও পোস্টার পড়িল—দুনিয়ার মজদুর এক হও। ঘনা নামে একটি ছেলে ছিল। তার বয়স তখন ষোলো সতেরো বছর হইবে। সে কালির কৌটা প্যাক করিত। সে এইট পর্যন্ত পড়িয়াছিল। বুঝিলাম হাতের লেখা তাহারই। মনে ভাবিলাম উহাকে কারখানা হইতে ছাড়াইয়া দিব, কিন্তু ইতিমধ্যে শুধু আর কারখানাই নহে, আশেপাশে গেঞ্জির কারখানা, লেদ কারখানার দেয়ালেও পোস্টার পড়িয়াছে দুনিয়ার মজদুর এক হও। মালিক তুমি হুঁশিয়ার। সবই লাল কালিতে লেখা। ক্ষেতে কিষান কলে মজুর তৈরি হও, জোট বাঁধো, অনেক রকমের হাতের লেখা। লাল কালি, এই লাল রং আমার চেনা। এই সময় আমার বাড়ির সামনের দেয়ালে পোস্টার—আমার নাম তোমার নাম ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম। একদিন গভীর রাতে উঠিয়া গোপনে ভিয়েতনামের গন্ধ শুঁকিলাম। হালকা গোলাপের গন্ধ। আমার কালির। চাষার ঘরে, মজুরের ঘরের মেয়েরা ওই কালি ঠোঁটে দেয়। একদিন ঘনার প্যান্টের পকেট সার্চ করিলাম। পকেটে কালির বড়ি। সে বলিল—এই কালি

সে পার্টির ছেলেদের দেয়। বিক্রি করে না। চুরির দায়ে তাহাকে বরখাস্ত করিলাম, কেহ কিছু বলিতে পারিল না। ঘনা মাথা নিচু করিয়া মাহিনা বুঝিয়া লইবার সময় বিড় বিড় করিয়া কী বলিতেছিল বুঝি নাই। পরে, দুলাল তার কারবারে ঘনাকে নিয়াছিল, আমি তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়াছিলাম। আবার বিষয় হারাইয়া ফেলিয়াছি। বৃদ্ধ বয়সের ইহাই দোষ। এক কথা বলিতে গিয়া অন্য কথায় চলিয়া যাইতেছি। রেখার বিবাহের কথা বলিতেছিলাম। এইবার দুলালের বিবাহের কথা বলিব।

আমার মনে হয় আমাদের বংশের একটি ছক আঁকিয়া দেয়া উচিত। ইহাকে বংশলতিকা বলে। আমার নাতি নাতনিগণ এত নাম মনে রাখিতে পারিবে না। কাহার সহিত কী সম্পর্ক গোলাইয়া ফেলিবে। তখন এই বংশ লতিকা দেখিয়া নিবে। এই বেলা আমি বংশলতিকা তৈয়ারি করিয়া দিতেছি।
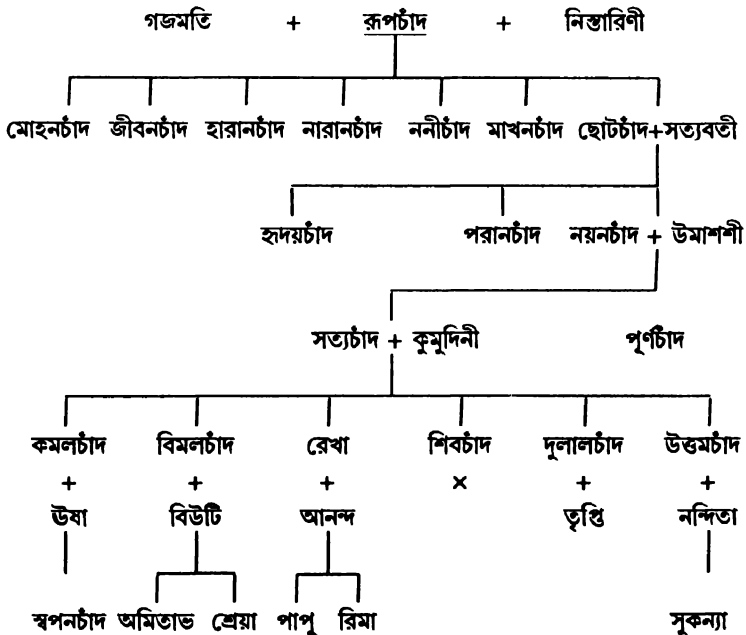
শিবু যেমন বোমভোলা হইয়া ঘুরিত, দুলাল ওইরূপ না হইলেও বলা চলে কমল-বিমলের মতো নয়। নিজের ভালো নিজেই বুঝে না। কমল, বিমলকে আমি নিজে কারবার গড়িয়া দিলাম, দুলালকে দিতে পারি নাই, কিন্তু নিজে কখনওই বলে নাই বাবা—আমাকে তুমি কম দিয়াছ। বৌমাদের ম্যাটিনিং শো-এর সিনেমার টিকিট দুলালই কাটিয়া আনিত। কাহাকে যদি ডাক্তার দেখাইতে হয়, সঙ্গে কে যাইবে? দুলাল যাইবে। শিমুলতলার টিকিট কাটিতে কে যাইবে? দুলাল। সংসর্গে পড়িয়া দুলাল কাস্তে হাতুড়ি হইল। আমি বলিলাম যাহারা বলিতেছে, মালিকের গায়ের চামড়া দিয়ে শ্রমিকের পায়ের জুতো তৈরি হবে, তুমি তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করিতেছ?

দুলাল বলিত ওরা অনেক হাই স্ট্যান্ডার্ডের ছেলে, ও তুমি বুঝবে না। দুলাল আরও বলিত—পৃথিবীতে একদিন গরিব বড়োলোক ভেদ থাকিবে না। টাকার দেমাকে সমাজের মাথা হওয়া চলিবে না ইত্যাদি কত কথা।

আসলে হরিহর চক্রবর্তীরা ঠিকই দুই এক পিস থাকিয়া যায়। যে হরিহর নেতাজীকে স্বপ্ন দেখিত। দুলাল কি জ্যোতি বসুকে নেতাজী ভাবিতেছে? আমি বলিয়াছিলাম নেতাজী আর জ্যোতিবাবু কি এক হইল? দুলাল বলিত জ্যোতিবাবু কোনো ফ্যাক্টর নয়, ও তুমি বুঝবে না। দুলাল প্রথমে বলিয়াছিল কারবার করবে না, চাকুরির চেষ্টা করিবে, কিন্তু চাকুরি কোথায় পাইবে? সে একটা ছোটখাটো ব্যবসা শুরু করিল। গঙ্গার ধারে নাটোরের রাজাদের একটি বাড়ি খোকা মস্তান দখল করিয়া লইয়াছিল। খোকার নিকট হইতে রাজার উঠানের কিছুটা অংশ ভাড়া লইয়া দুলাল শিশুদের তিন চাকার সাইকেল, চারচাকার ঠেলা, এই তৈয়ার করিত। আমি যে ঘনাকে কালির বড়ি চুরির দায়ে তাড়াইয়া দিয়াছিলাম, সেই ঘনাকে দুলাল ওর কারবারে নিল।

আমার ছোটো পুত্র কুটু (উত্তমচাঁদ) কিন্তু পড়াশুনায় ব্রিলিয়ান্ট। কুটুর প্রাইভেট টিউটর বলিত কুটুকে বুঝাইব কি, সে সব নিজেই বুঝিয়া যায়, কেন মাস্টারের পিছনে এতগুলো টাকা খরচা করছেন।

কুটু যাদবপুর হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করিল। তখনই একটি বাঙালদের মেয়ের সঙ্গে ভাব-ভালোবাসা শুরু করিয়াছিল। পাস করিয়াই চাকুরি পাইল, আর চাকুরি পাইয়াই তার মাকে বলিল সে একটি মেয়েকে ভালোবাসে, তাহাকে বিবাহ করিবে। মেয়েটি ব্রাহ্মণের ঘরের, বাঙাল। কুমুদিনী আমার নিকটে আসিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল ব্রাহ্মণের মেয়ে যদি পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করে তবে পাপ হইবে। কী রূপে এই বিবাহ সম্ভব? সমাজ আছে।

আমি বলিলাম এই বিবাহ হইতে পারে না। কুমুদিনী তখন দ্বিগুণ জোরে কাঁদিতে লাগিল। কুমুদিনী বলল—অমত কোরো না, কুটু অনেক দূর গড়িয়েছে। এখন আর নিষেধ হয় না।

আমি বলি তুমি কি মেয়ে দেখেছ? কুমুদিনী বলিল কুটু একদিন বাড়ি নিয়া আসিয়াছিল। মেয়েটি সুন্দরী।

আমি বলিলাম হোক সুন্দরী, আমার মত নাই।

কুমুদিনী বলিল ভালোবাসায় বাধা দিলে কি রূপ হয় জানো না? শরৎচন্দ্রের বই পড় নাই, জানিবে কী রূপে? আমি শেষ পর্যন্ত মত দিলাম। শরৎচন্দ্রের জন্যই বিবাহটা শেষ পর্যন্ত ঘটিল। আমি বলিয়াছিলাম কুটু না হয় এই রূপ লাভ ম্যারেজ করিবে, কিন্তু কুটু দুলালের ছোটো। দুলালের বিবাহের পূর্বে কী রূপে কুটুর বিবাহ হয়। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখিলাম কম্পিউটার বিবাহ। পাত্রপাত্রীর বিবরণ দিয়া দিলে কম্পিউটারই মিলাইয়া দিবে। আমি ভাবিলাম সেই ভালো। কিন্তু কম্পিউটার কী বস্তু তখনও জানি না। কম্পিউটার প্রজাপতি অফিসে গিয়া প্রথম কম্পিউটার দেখিলাম। একেবারে আমাদের কোনার্ক টিভিটিরই মতন, তবে একটু ছোটো। একটি ফর্ম ফিলাপ করিয়া দিলাম। উহার মধ্যে একচুয়াল জন্ম তারিখও ছিল। রাশি নক্ষত্র ছিল না। একজন ভদ্রলোক টাইপের মতো একটু খটখট করিয়া বলিয়া দিল ধনু রাশি, উত্তরাষাড়া নক্ষত্র। নর গণ। একেবারে কাঁটায় কাঁটায় মিলিয়া গেল। কিছুদিনের মধ্যেই উহারা কম্পিউটার ম্যাচিং পাত্রীর সন্ধান দিল। পাত্রীর নাম তৃপ্তি। ম্যাট্রিক ফেল। রং ফর্সা। কুষ্ঠিতে

রাজযোটক হইয়াছে। দেখিতে গেলাম। পাঁচপাচি মেয়ে। আমাদের দুলালই বা এমন কী! মেয়েটি চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। কম্পিউটারে যে বিবরণ ছিল, তাহাতে বলা ছিল পাত্রী শান্ত, ঘরোয়া, গৃহকর্মনিপুণা। দুলালকে বলিলাম মেয়ে দেখে আয়, দুলাল বলিল যাইবে না, শেষকালে গেল। কিন্তু তেমন কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল না। বাবা দুলাল, তুমিও তো দুটো কথা কইতে পারতে, তুমি না আজকালকার ছেলে? কথা কইলেই বোঝা যেত। কুমুদিনীও কিছু বুঝিল না। বড়োবৌমাকে বলিয়াছিলাম, সে গেল না। বিবাহ হইল। ফুলশয্যার পরদিনই দুলাল আমাকে বলিল—বাবা, মেয়েটা পাগল।

বাবা দুলাল, আমি কীরূপে বুঝিব? আমি তো ঘটক নয়, কম্পিউটারের ওপর নির্ভর করিয়াছিলাম। যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা বরাতে ছিল, নাকি কম্পিউটারে ছিল। ইহাই বিধাতার লিখন ভাবিও, তবেই শান্তি পাইবে। মেয়েটির দোষ কী, মেয়েটিকে কষ্ট দিও না। উহার চোখে জল দেখিয়াছি। পাগলও কাঁদে।

কুটু তার বিবাহ নিজে নিজে ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিল। সে কারণে তাড়াহুড়া করিয়া দুলালের জন্য পাত্রী ঠিক করিলাম। ভালো করিয়া খোঁজ খবর করা হয় নাই। এখন আর কী করা যাইবে। বাবা দুলাল, উদ্ধব ঠাকুরের আশ্রয় লইও। শান্তি পাইবে। দুলালের বিবাহের বাইশ দিন পরই কুটুর বিবাহ হয়। প্যান্ডেল, রাঁধার বামুন, বাজারহাট সব দুলালই করে। আমার মন মেজাজ খুবই খারাপ ছিল। তবু বরযাত্রী গিয়াছিলাম। খুবই ভালো আপ্যায়ন করিয়াছিল। কিন্তু ভাত করিয়াছিল। রাতের বিয়েবাড়িতে বাপের জন্মে প্রথম ভাত দেখিলাম। আমরা বলিলাম আমরা রাতে ময়দা খাই, কন্যার পিতা গলবস্ত্র হইয়া ক্ষমা চাহিল এবং অল্প সময়ের মধ্যেই লুচি করিয়া দিল। কুটুর বউ নন্দিতা বেশ ভালোই হইয়াছে। এত যে শিক্ষিত কে বলিবে? দই-ইলিশ বড়ো ভালো রাঁধে। যে কচু খাইতে বাড়ির সবাই বড়ো ভয় করিত, সেই কচু রান্না করিয়া খাওয়াইল, গলা কুটকুট করিল না।

যাহা হউক, পুত্র কন্যাদের বিবাহের কথা লিখিলাম। আরও কত কথা আছে বলিতে ইচ্ছা করে। কিছু কথা বলা যায় না। সল্টলেকের বাড়িতে

কমলকে থাকিতে বলিয়াছি। নাথের বাগানের বাড়িতে তোমরা মিলিয়া মিশিয়া থাকিও। তোমাদের পৃথক পৃথক ঘর ভাগ করিয়া দিয়াছি। আমার নিজের জন্য যে ঘর দুইটি এখন রাখিয়াছি, আমার অবর্তমানে উহা অতিথিদের জন্য থাকিবে। রেখা যদি আসে কিংবা কোনো পুত্রের শ্বশুড়বাড়ির কুটুম আসে, তবে ওই ঘরে থাকিবে। ঘর লইয়া তোমরা ঝগড়াঝাটি করিও না। নাথের বাগানের এই বাড়ির তলায় একটি নৌকা পোঁতা রহিয়াছে। কে বলিতে পারে উহা যে আমাদের পূর্বপুরুষের হারানো নৌকা নহে? নৌকার গায়ে নখের আঁচড়ের চিহ্ন দেখিয়াছিলাম। বাবা শিবু, তুমি যতই বলো তুমি ফাসক্লাস্ আছ, আমি তো জানি, তোমার সারা গায়ে নখের আঁচড়, আঁচড়ের দাগ। আমি তোমাকে মনে মনে জাপ্টাইয়া ধরি। তুমি বুঝ না।

দুই

মাইডিয়ার বাবা, তোমার ছবিতে মালা দিচ্ছি আমি, আমি শিবু, শিবচাঁদ, তোমার ঝটতি পটতি ছেলে। তোমার বাজে খরচ। মায়ের ছবিতেও এই আমিই মালা দি, তোমার আর কোনো সোনার চাঁদ মালা দেয়নাকো। এই অধমই এখনও মালা দিয়ে যায় প্রতি বেস্পতিবারে, প্রতি শনিবারে। বেস্পতিবারে বাবার মৃত্যুদিন, শনিবার মায়ের। মায়ের ছবির সামনে আমি পিঁয়াজের বড়া রাখি, যদি পাই। মদন সকালবেলায় জেনারেলি পিঁয়াজি ভাজে না। যে দিন ভাজে, কিনে আনি। মা পিঁয়াজি ভালোবাসত। বাবার ছবির সামনে মাঝে মাঝে একটু আধটু রামনাম করি। বাবা, তোমার ওই ডায়েরির খাতায় অনেক কথাই লিখেছ, সব ভালো কথা। কিন্তু তোমার ঘরের খাটের তলায়, কিংবা ওই দেয়াল আলমারিতে আমি যে ওল্ড মংকের রামের্ বোতল দেখেছি। উদ্ধবঠাকুরের দীক্ষা নেবার পরেও। তোমার আত্মা কি এখন মাল খেতে চায়? তবে তুমি পেসাদ করে দাও, আমি পেসাদ পাই। আগে তুমি ছুপে খেতে। এখন তোমায় কেউ দেখতে পাচ্ছে না, খাও, খেয়ে নাও। মরে গেলে, জ্যান্ত মানুষের সঙ্গে মরা মানুষের রিলেশনটা কি রকম পালটে যায়, কত ফ্র্যাংক হয়ে যাওয়া যায়। আচ্ছা বাবা, তুমি যখন বাইরে যেতে পারতে না, কে তোমাকে রাম এনে দিত? বড়দা? সল্টলেকের বাড়িটা তাই বড়দা পেল?

যাকগে যাক। ওসব কথা এখন থাক। সক্কালবেলা মন মেজাজ খারাপ করে লাভ নেই। পেসাদটা খেয়ে নিয়ে এবার বেরুতে হবে। আমি হলুম শালা কুকুর। কুকুরের কাজও নেই, আবার অবসরও নেই। একনম্বর পয়েন্ট। আমার মান অপমান জ্ঞান নেই। কেউ একটু ভালোবাসলেই

শরীরটা কেমন যেন করে ওঠে। ল্যাজটা নেই বলে, থাকলেই নড়ত—দু নম্বর পয়েন্ট। এরকম আরও পয়েন্ট দেয়া যায়।

লুঙ্গিটাকে বাথরুমে বালতিতে ভিজিয়ে দিতে হবে। গতরাতে একটু হয়ে গেছল। দাগটা রয়েছে। সিকসটি টু হল বয়স। এখন এসব কেন হচ্ছে? এসব না হলেই ভালো। বেশ কিছুদিন আগেও লুঙ্গিটায় এরকম হয়ে গেছল। বারান্দার রেলিং-এ রেখেছিলুম পরে ধুয়ে দেব বলে, দুলালের পাগল বৌটা মাঝে মাঝেই ঘুরঘুর করে। ও রেলিং-এ লুঙ্গিটাকে দেখছিল। দেখেই মেলে ধরেছিল তারপরই ওটাকে নিয়ে বাথরুমে ঢুকল, আমাকে কেড়ে নেবার ফুরসতই দিল না। আমি জলের আওয়াজ পাচ্ছিলাম, আর কান্নার। কাঁদছিল কেন কে জানে? এখন আমি ধুতি পরছি। ধুতি ফুলশার্ট। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় যেমন পরতেন। প্যান্টও আছে, মাঝে মাঝে পরি। কিন্তু প্যান্টের জিভ টানতে ভুলে যাই। ও, জিভ তো নয় জিপ্। ফ্যাচ করে শব্দ হয়। হ্যাঁ ভুলে যাই তো, কী করব। ধুতির এই সমস্যা নেই। সেন্টটা শেষ হয়ে গেল। যাঃ শ্‌শলা। টা-টা মা কালী। মা মাগো হয় দেখা দে, নয় টাকা দে।

এখন যাব একটু...। কার কাছে?

তিন অক্ষরের নাম তার গাছে শোভা পায়, প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে বাঙালেরা খায়, শেষের অক্ষর ছেড়ে দিলে কী যে হল মাল, আজকে না পারিলে বোলো তবে কাল। আরে মালতী, মালতী! এবার মালতীর কাছে যাব। ক'দিন যেতে পারিনিকো। দাঁতটায় ব্যথা। তুলে ফেলতে হবে। মায়ায় পারি না। মালতীর জন্য কী নিই? আজ শালা ফুল নিয়ে যাব। বহুদিন ফুল নিইনি। বেলফুল কি এখন পাব? আশ্বিনে কি বেলফুল হয়? আজকাল সবই হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে ফুলকপি, পৌষে ঝিঙে, বিচিছাড়া পেয়ারা, কি না হয়। একটা ফ্রকও নিয়ে যাব। মালতীর নাতনিটার জন্য। জামা। কী রং নেব? রং কী দেখতে পায় ও? পুজো এসে গেল। সূর্যের ফোকাস পড়ছে গঙ্গার জলে, মেঘের হালকা হালকা চিপ্‌স উড়চে আকাশে। পুজো কবে? মালতীর নাতনিটার বোধ হয় খবর হয়ে গেছে। চোখের খবর। ছোটোবেলায় তো

বুঝতে পারেনি কিছু, সব বাচ্চার যেমন চোখ হয়, তেমনই চোখ। চোখের মণিটাও নড়ত, যেমন নড়ে, আওয়াজে মুখ ঘোরাত, চোখ ঘোরাত। হামাগুড়ি শেখার পর বোঝা গেল চোখে দেখতে পাচ্ছে না বাচ্চাটা। হামাগুড়ি দিতে গিয়ে দেয়ালে ধাক্কা খাচ্ছে, দরজায় ধাক্কা খাচ্ছে। চোখ দেখাল। কাজ হল না। ওদের পাড়ায় এরকম হয়। মায়ের রোগে সন্তান ভোগে। ও বাড়িতেই একটি মেয়ে আছে, বছর কুড়ির হবে এখন। অন্ধ। কী সুন্দর, কিন্তু চোখে দেখে না। জন্ম থেকেই চোখে দেখে না। ও জানতেই পারল না ও কতটা সুন্দর। ও জানতেই পারল না যে অঙ্গের লোভে পুরুষরা আসে, সে অঙ্গ কেমন। যে পুরুষেরা ভোগ করে গেল, সেই সব পুরুষদের ও দেখতে পারল না, বুঝতে পারল না।

একদিন ৮ নম্বরের ছাতে নাচের আসরে সবাই গেল। জবালা ক্লাবের ফাংশন। এখন এই সব হয়েছে। বেবুশ্যেদের আজকাল যৌনকর্মী বলছে। পড়াচ্ছে। ওদের ফাংশনে সবাই গেল, অন্ধ মেয়েটা গেল না। কেন যাবে? ও একা ছিল, দেয়াল হাতড়ে ছাতে গিয়েছিল। ওই ছাতে মেয়েটাকে রেপ করে গেল। কারা করল মেয়েটা জানে না। কজন তাও নয়। ওখানে এত পাওয়া যায়, তবুও রেপ? সবাই চিত্রাঙ্গদা দেখে ফিরে দেখল মেয়েটা কাতরাচ্ছে।

মালতীর খুব চিন্তা। রেখার তো হবেই। মা বলে কথা। মেয়েটার নাম দিয়েছে সুকন্যা। ওই জবালা ক্লাবের কাণ্ড। এসব মেয়েদের এরকম নাম হয় নাকি? ওই সুকন্যাকে চোখের বড়ো ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। মাদ্রাজ থেকে এক বড়ো ডাক্তার এসেছে কলকাতায়। ওই জবালা ক্লাবই রেখার মেয়েকে ডাক্তার দেখিয়েছে। গতকালই বোধ হয় ডেট ছিল। কে জানে কী বলেছে?

মেয়েটার চোখ যেন ভালো হয়ে যায়। যেন এই পৃথিবীটাকে দেখে, যত খারাপই হোক, মানুষগুলোকে দেখে। সিঁড়িটার দেয়ালে চল্‌টা উঠে গেছে। বাবার তৈরি করা বাড়িটার কোনো মেনটেনেন্স হয় না। বাড়িটার গভ্‌ভে নাকি একটা নৌকো পোরা আছে। সিঁড়িটা একতলা থেকে দোতলায়

যেখানটায় শেষ হয়েছে, আবার তিনতলার দিকে উঠে যাবে, ওখানে দেয়ালের বালিতে পেরেক দিয়ে খোদাই করা আছে একটা 'ভ' অক্ষর। ওটা আমারই কাজ। কাজ, না কারুকাজ! কেন 'ভ' লিখেছিলুম? ভালোবাসা লিখতে চেয়েছিলুম নাকি? ভ-এ কত কি হয়। ভাই হয়, ভীম হয়,ভুক ভুক হয়, ভেড়ুয়া হয়, ভয় হয়...। সেই কবে একটা পেরেক দিয়ে দেয়াল কুঁদে 'ভ' লিখেছিলুম, ওটা আর শেষ করা হল না।

একতলা থেকে ঝিন-চাগ আসছে। স্টিরিও বাজছে। ওরা ইংলিশ গান চালালে আমিও শ্যামাসঙ্গীত চালিয়ে দি। লে, বোঝ। একতলায় থাকে বি বি। বিমল + বিউটি। ওদের নাতি-নাতনিরা এখন ছুটিতে। তাই হুল্লোড়। হুল্লোড়ের শব্দ হই হই করতে করতে ওপরে আসে। মজা। গেরস্থের মজা। এই, কী হচ্ছে, গান থামা, নাতনিরা থামায় না। মজা। নাতনিরা কথা শোনে না। মজা। ওরা বিছানা ওলোট পালট করে, ডাইবিটিজের ট্যাবলেটের সঙ্গে গ্যাসের ট্যাবলেট মিশিয়ে দেয়, আইসক্রিম খাব আইসক্রিম খাব বায়না করে, মাথার চুলে প্রজাপতি ক্লিপ আঁটে, ঠোঁটে বেশি করে লিপস্টিক দেয়। আর মেজদা তখন বলে, আয়, টুসকি, তোকে এবার বিয়েই করব। গেরস্তর মজা। মজা—আফটার সিক্সটি। কাঁঠালের রস। মাছির মতো, নীল মাছির মতো ধেয়ে যেতে ইচ্ছে হয়।

আমি যাই না, ওদের ঘরে যাই না। কোথাও যাই না। কোথাও যাই না বললে মিথ্যে বলা হবে, আমি ছাতে যাই। ওদের ঘরে টরে যাই না। ছাতে যেতে গেলে কুটুর রান্নাঘর থেকে আসা ভিনিগারের গন্ধ পাই, বুঝি, চিলি চিকেন হচ্ছে। বাসমতী চাল ফোটার গন্ধ পাই, বুঝি পায়েস হচ্ছে। পায়েস হওয়া মানে জন্মদিন। ওদের কারুর জন্মদিন। জন্মদিনে আমি শুধু পায়েসের গন্ধ পাই। বিমলের নাতনি বুঝি আমারও নাতনি নয়? অমিতাভর মেয়ে। মৌ আর জরি। মৌ-জরি কে দু-বছর আগেও পুজোর সময় ঠাকুর দেখাতে নিয়ে গিয়েছি। কাঁধে করে ঠাকুর দেখিয়েছি, ফ্রক কিনে দিয়েছি—মনে মনে। এখনও ওদের মনে মনে ল্যাবেনচুস না দিয়ে পারি না। সত্যি সত্যি দিতে পারি না আর, দিইনাকো। কিছুদিন আগে দোতলা দিয়ে উঠছিল, ওরা

দুজনে। হাতটা ধরে দুটো ল্যাবেনচুস ওদের ছোটো ছোটো হাতের মধ্যে গুঁজে দিয়েছিলুম। একটু পরেই আমার ঘরের জানলার ধারের টিনের চালে ঠং ঠং দুবার। কাকেরা ছুটে এল। এত বড়ো বড়ো ল্যাবেনচুস কী কাকেরা খেতে পারে?

আমার ঘরের ঠিক ওপরেই কুটুর ঘর। ওর ঘর থেকে যা কিছু ফেলে দেয়, আমার ঘরের জানালা দিয়ে সামনের টিনের চালে পড়ে। আমার ঘরের থেকে গেঞ্জিকলের টিনের চালটা দেখা যায়। ফেলে দেয়া জিনিসগুলো দেখতে পাই আমি। আগে দেখতুম উইলস সিগারেটের প্যাকেট, এখন দেখি ডানহিল, ফাইভ ফিপটি ফাইভ। কালো রঙের বড়ো কাগজের খোল। ওগুলো ব্ল্যাক লেবেল হুইস্কি। লাস্ট খেয়েছিলুম পুচুর বাড়িতে। পুচু ভোটে জিতে খাইয়েছিল। আমার ভাই টাকা নাই, আমি তাই বাংলু খাই। আমার সোনার বাংলু আমি তোমায় খাংলু। বারদোয়ারিটা নাকি আগে ছিল রানী রাসমণির জগদ্ধাত্রী মন্দির। বারোটা দুয়ার ছিল, তাই বারোদুয়ারী। মাঝে মাঝে পয়সা পাতি পেলে, শখটখ হলে রাম। এখন যেমন রামপ্রসাদী হল। ডুব দে রে মন কালী বলে। কালির কারবার এখন কোন কালিমায় এসে ঠেকেছে। আচ্ছা বাপ আমার, ফাদার সত্য, যাহা বলিবে সত্য বলিবে, সত্যি বই মিথ্যা বলিবে না। তুমি কি সত্যিই জানতে না তোমার মেজ ছেলে বিমলচাঁদ দু নম্বরি শুরু করেছে? তুমি তো ওকে ন্যাপথালিনের কারবার ধরিয়ে দিয়ে হরি হরি করতে থাকলে। তারপর তোমার জীবিত কালেই ওরা বাবার মেশিনের ডাইস চেঞ্জ করল। সেম মেশিন, সেই জার্মান মেশিন, শুধু ডাইস চেঞ্জ। ডাইস চেঞ্জ করে কালির বদলে আগে তৈরি হয়েছিল ন্যাপথালিন, আবার ডাইস চেঞ্জ করে ন্যাপথালিনের বদলে ওষুধের ট্যাবলেট। ব্র্যান্ডের নামও একই রয়ে গেল। ভারত কালি, ভারত ন্যাপথালিন, এরপর ভারত ফার্মাসিউটিকালস্। ভারত ফার্মাসিউটিকাল্‌স্-এ এখন ওই পুরনো জার্মান মেশিনটা ছাড়াও আরও মেশিন এসেছে। কারখানায় যারা কাজ করে ওদের বি পি লাগানো জামা। বি পি মানে ব্লাড প্রেশারও হয় আবার ভারত ফার্মাসিউটিকালস্‌ও হয়। এ

সি ঘরে অমিতাভ বসে। মেজদার ছেলে। বাবা বেঁচে থাকতেই তো পুঁটে, মানে অমিতাভ অফিসে বসতে শুরু করেছিল। মেয়ে টাইপিস্ট রেখেছিল। হসপিটাল সাপ্লাই ধরেছিল। বাপ আমার, তুমি কি একেবারেই জানতে না তোমার বসানো মেসিনের ডাইসে চকখড়ির গুঁড়ো দিয়ে ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট হচ্ছে, ভিটামিন বড়িতে ভিটামিন নেই। ছাতে ত্রিপলে ঢাকা কয়লার ছাইয়ের বস্তা বিমলের কারখানার কোন কম্মে লাগছে জিজ্ঞাসা করেছ কখনও? মেজদা তোমার উদ্ধবঠাকুরের কাঠের সিংহাসনে টুনি লাইট ফিট করিয়ে দিয়েছিল। তোমার ইচ্ছে হলেই ছাতে ম্যারাপ বেঁধে ক্ষান্তিলতাকে দিয়ে কীর্তন করিয়ে দিয়েছে, ঠাকুর আনিয়ে মালপো ভাজিয়ে দিয়েছে। গোবিন্দকে নকুলদানা দেবার মায়ের আমলের যে রুপোর রেকাবিটা ছিল, সেটা চুরি হয়ে যাবার পর একই রকম দেখতে রুপোর নতুন রেকাবি করে দিয়েছে। তোমার অসুখের সময় ডবকা ডবকা নার্সও রেখে দিয়েছে মেজদা, নার্সেরা তোমার গা টিপে দিয়েছে, চান করিয়ে দিয়েছে, ক্যাথিটারও পরিয়ে দিয়েছে। তোমার হিসির অসুখ। প্রস্টেট গ্ল্যান্ড। তোমার ঘরে কালার টিভি ঢুকিয়ে দিয়েছে মেজদা। মায়ের মৃত্যুর পর তোমার দেখভাল করেছে মেজবৌদি। কুটুর বৌয়ের ক'দিনের। দুলালের বৌয়ের মাথায় তো ভিমল কটন মিলের কারখানা, মেজবৌদির নাম তুমিই দিয়েছিলে বিউটি। ওরা হংকং ঘুরে এল। একটা কথা বলা মেশিনের পাখি নিয়ে এসেছিল। পাখিটাকে দেখাতে এনেছিল আমাকে। আমি পাখিকে বলেছিলাম বিম্‌লে একটা ফেরেববাজ। পাখিটা ওদের ঘরে গিয়ে বলেছিল কথাটা। তারপর থেকেই মৌ-জরিকে আমার কাছে আসতে দেয় না ওরা। এলে ওদের দাদুনদাদা ভীষণ মাইন্ড করবে মৌ-এর মা বলেছে। এরকম কেস-এ আমার বাপের আমলে বলা হত ওঘরে গেলে একদম ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব, পোঁদিয়ে বিন্দাবন দেখিয়ে দোব। আর পুঁটেদের আমলে খুব মাইন্ড করব। কিন্তু আমি তো জানি ওটার মানেই মেরে ঠ্যাং ভেঙে দেয়া। মৌ-জরিরা আসে না বলে আমার যেটা হয়, সেটা ঠিক মাইন্ড নয়, কী রকম যেন, কী করে বোঝাই, যেন নর্দমার ঢাকনা চুরি হয়ে গেছে। খোলা নর্দমার

মুখটা অসহায় ভাবে হা করে আছে। যেন গাড়ির হর্নের পিকাপ-টা ফুটো হয়ে গেছে, বাঁশিটা আছে। ড্রাইভার টিপছে। কিন্তু হর্ন বাজছে না।

এ বাড়িতে এখন চারটে বাচ্চা। বিমলের নাতনি দুটো, আর কুটুর দুটো। কুটু আমাদের সবচেয়ে ছোটো ভাই। ওর দুটো বাচ্চা। মেয়েটা বছর বারোর হয়েছে, এরপর আবার ছেলে হয়েছে। কুটুমুটু। পুচুপুচু। কুটুর সাহস আছে বলতে হবে। এলেম আছে। বারো বছর পর ভাবা যায়?

এখন ঝুলন চলছে। বারো বছরের একটা মেয়ে আছে বাড়িতে, অথচ ঝুলন হচ্ছে না, ভাবা যায়? যুগটাই কী রকম ধারা পালটে গেছে। মৌ-জরিরা পুতুলের বিয়ে দেয় না। টুগলুরা ঝুলন সাজায় না। আমরা কি সুন্দর ঝুলন সাজাতুম। কাঠ চেরাইয়ের কল থেকে নিয়ে আসতুম কাঠের গুঁড়ো। আমাদের কালির বড়ি জলে গুলে সেই কাঠের গুঁড়ো রং করতুম। লাল রং-এর গুঁড়ো দিয়ে বানাতুম পাহাড়ি রাস্তা। বকাসুর বধ, গোবর্ধন ধারণ, এইসব পুতুলের তলায় লাল গুঁড়ো দিতুম, সবুজ গুঁড়ো দিয়ে মাঠ, কালো গুঁড়ো দিয়ে রাস্তা বানাতুম। ওই রাস্তায় নদের নিমাইকে জগাই মাধাই কলসির কানা ছুঁড়ে মারত, আবার সাহেব সার্জেন্ট, হাতে বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। গঙ্গার ’ধার থেকে কুড়িয়ে আনা পাথর দিয়ে তৈরি পাহাড়ের গায়ে ঘাসের চাপড়া দিয়ে তৈরি জঙ্গলের ভিতর থেকে উঁকি মারত সুন্দরবনের বাঘ। সামনেই পেখম তুলে দাঁড়িয়ে থাকত ময়ূর, পুতনা বধ করতো পুঁচকে গোপাল, তুলোর দাড়িওয়ালা বুড়ো স্প্রিং-এর মাথাটা নেড়েই যেত, ক্ষুদিরামের ফাঁসি হত, কংসের কারাগারে দেবকী-বাসুদেব বন্দী। নেতাজী হাত তুলে বলছেন দিল্লি চলো। একটুকরো ভাঙা আয়না যেন জল, যেন সমুদ্র, তার ওপর একটা ময়ুরপঙ্খী জাহাজ। সেই জাহাজে আমাদের পূর্বপুরুষ বাণিজ্যে যাচ্ছেন। ঝুলন সাজানো ওই আজব শহরটাই যেন অবন্তীনগর। সে যে রূপকথারই দেশ, ফাগুন যেথা হয় না কভু শেষ।

বাবা, তোমার ঘরে একটা রূপকথার ফাগুন মেশিন বসিয়ে দিয়েছিল মেজদা। এ সি মেশিন। তুমি আরামে ছিলে শেষ একটা বছর। ভারত

ফার্মাসিউটিক্যালের ভিটামিন বড়ি তোমাকে দেওয়া হত না। তুমি ধৃতরাষ্ট্র হয়েছিলে ওই ঠাণ্ডা ঘরে। ওষুধের দুনম্বরী কারবারের কথা তুমি কি বোঝনি? একটুও বোঝনি? আজ এই নাথের বাগানের বাড়িটার সামনে শ্বেতপাথর। শ্বেতপাথরে 'সত্য-ধাম' লেখা। মেজদা করিয়েছে। এই সত্য-ধামে আমরা থাকি। বাড়িটার ভিতের তলায় নাকি একটা নৌকা আছে। ওই নৌকোর ফাটা কাঠে তুমি তোমার পূর্বপুরুষের নখের আঁচড়ের চিহ্ন দেখেছিলে।

যাকগে যাক, আমি এখন মালতীর বাড়ি যাব। দুপুরবেলা মালতীর ঘরে খিচুড়ি খাব। টিপিস টিপিস বৃষ্টি পড়ছে সকাল থেকে। খিচুড়িটা জমবে ভালো। মালতীর বয়স হয়েছে মালতীর ঘরে এখন লোক আসে না, মালতীর মেয়ের ঘরে আসে। মালতীর মেয়ের নাম রেখা। ওর বাপ কে মালতী জানে না। আমি নই। আমি যখন থেকে মালতীর ঘরে যাওয়া আসা শুরু করেছিলাম, তখনই রেখার বয়স ছ-সাত বছর। রেখা আমায় কাকু ডাকে। পুজোয় রেখাকে শাড়ি দি, দশমীতে, পয়লা বোশেখে রেখা আমায় প্রণাম করে। ওদের বাড়িতে আমার খুব হইহই হয়। জীবন তো হইহইও চায়, নাকি! দশ নম্বর দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিটে আমার হইহইরা পড়ে থাকে। মালতীর মুখে এখন কালচে দাগ। তবু ওর হাসি মুখ ভালো লাগে। বাঁধানো দাঁতের হাসি। ওই দাঁত আমি বাঁধিয়ে দিয়েছি।

দাঁতের ডাক্তার মদন গুপ্ত আমায় খুব চিনত, বলেছিল এঁকেই রেখেছেন বুঝি? আমি বলেছিলুম—উলটো করে বলুন। ওই তো আমাকে রেখেছে। তাই শুনে ও হেসেছিল, তখন দাঁত ছিল না বলে মুখে টুক করে কাপড় চাপা দিয়েছিল, সেই হাসিটাই হেবি ছিল। পরে, ঝকঝক করা পালিশ মারা দাঁতে ওই স্ট্যান্ডার্ডের হাসি দেখিনি। ফোকলা হয়ে যাবার আগে মালতীর সামনের দুটো দাঁত একটু উঁচু ছিল, ফলে দুটো দাঁত সব সময় ওপেন। সবসময়েই হাসি হাসি। দাঁত বাঁধাবার পর ঠোঁটের স্ক্রিন খুলতে তবে দাঁতের অ্যাক্টিং দেখা যায়। একটু আগে আগেই দাঁত খারাপ হয়ে গিয়েছিল

মালতীর। সোনাগাছির মেয়েদের দাঁত ভালো থাকে না। খাবার ঠিক নেই, শোয়ার ঠিক নেই, অ্যাসিড গ্যাস অম্বলে দাঁত নষ্ট হয়ে যায়। আমারও তো মুখের দুপাশের ব্যালকনির দুটো করে দাঁত নেই। সামনেও দাঁত নেই। সামনেও দুটো নড়ছে। এমনিতে ঠিকই ছিল। দাঁত আমার খারাপ ছিল না, পাঁঠার হাড় চিবিয়ে ছাতু করে দিতুম, ঘুষি খেয়েছিলুম বলে আমার সামনের দাঁতটা নড়ে গেল সত্যি কথা। কিন্তু ওই শালা আমার মুখে ঘুষিটা মেরেই 'ওরে বাব্বা' বলেছিল আমার বেশ মনে আছে। ঘটনা হয়েছিল কি, সে দিন মালতীর ঘরে লুডো খেলছিলাম, রমা, যমুনা, ওরাও ছিল, সবাই অ্যাবাভ ফিপটি। রেখার লোক এসেছিল, পাশের ঘরে। রেখা হঠাৎ তোয়ালে জড়ানো অবস্থায় আমাদের ঘরে চলে আসে। বলে ঘরের লোকটাকে হাটিয়ে দাও তো, বহুত ঝামেলা করছে। মালতী জিজ্ঞাসা করল, কী করছে সে? রেখা বলল—দেখো না, হারামিটা খালি নখ দিয়ে খামচাচ্ছে। মালতী তক্ষুনি কোমরে আঁচল গুঁজে চলে যায়, খিস্তি দেয়। লোকটা বলে পয়সা খরচ করে এখানে এলাম কী ছিঁড়তে। মালতি বলে, বসতে এয়েচো, বসে চলে যাও, খামচা-খামছি,করছ কেন। লোকটা নিজের হাতদুটোকে মুঠো করে দেখতে থাকে। একটু পরে রেখার ঘরে চিৎকার। রেখা চেঁচাচ্ছে। তখন লছমন ছিল না। আমি লোকটাকে গলাধাক্কা দিই, লোকটা তখন আমার গালে ঘুষি মারে। মেরেই উরিবাব্বা বলে ওর হাতটা ঝাঁকায়। ওর হাতে খুব লেগেছিল। আমি তখন সরি বলতে গিয়ে বুঝতে পারি আমার দাঁত নড়ে গেছে। নড়ুক গে যাক, ফেলে দেব। পুরো দাদু হয়ে যাব তখন বেশ, পিওর দাদু হয়ে যাব। ফোকলা দাদু। দাড়ি রাখব, সাদা সাদা, নাতি-নাতনিগুলোর সঙ্গে গোল হয়ে বসে মুড়ি তেলেভাজা খাব মাড়িতে চিবিয়ে, আর গল্প করব আমাদের ছিল এক দাদুর দাদু। নৌকা করে বাণিজ্যে যেত। একবার হল ঝড়। নৌকা ডুবল, আর ওই দাদুর নাতি-নাতনিগুলো গেল ছিটকে। একটা নাতি পড়ল এইখানে... এই নাথের বাগান ইস্ট্রিটে।

মালতীকে নিয়ে একবার দীঘায় গেস্‌লুম। জেলে নৌকাগুলোকে দেখিয়ে মালতী বলেছিল তোমাদের কোন ঠাকুদ্দার নাকি নৌকা ছিল বলো,

ওরকম? আমি বলেছিলুম হুঃ, কী যে বলো। অবন্তীনগরের সওদাগরদের নৌকা কীরকম হয় কী করে বোঝাব ওকে?

ওই একবারই গেস্‌লুম ওকে নিয়ে বেড়াতে। ও শখ করে শাখা-সিঁদুর পরেছিল, ঘোমটা দিয়েছিল, সমুদ্দুরের হাওয়া বারবার ঘোমটা সরিয়ে দিচ্ছিল বলে রাগ হচ্ছিল বারবার। বলছিল হাওয়া কি হারামি দেখেছ, বৌ থাকতে দেবে না। সমুদ্রে চান করেছিলুম, ও সালোয়ার কামিজ, আমি বারমুডা, ওকে হাত ধরে চান করিয়েছিলুম। সমুদ্দুরে নেয়ে, ও ওর ভিজে জামার ওপর তোয়ালে চাপিয়ে হোটেলে গেল। সামনে দাঁড়ানো মাঝবয়েসিগুলোর দিকে তাকিয়ে বলছিল—কেমন ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে হারামিগুলো, চক্ষু গ্যাইলা দিতে হয়। মাঝে মাঝে মালতীর বাঙাল ভাষা বেরিয়ে পড়ে। ওর মা বাঙাল ছিল কিনা, রিফিউজি। মালতী বলেছে, বাঙাল দেশের কথা ওর কিছু মনে নেই। ওর মায়ের হাত ধরে অনেকটা পথ হেঁটেছিল, পায়ে কাঁটা ফুটেছিল, মায়ের চিৎকার শুনেছিল, আবার কান্না এক অন্ধকারে, তারপর আবার পথ হেঁটেছিল। সেই ছোটোবেলা থেকেই মালতী দেখেছে ওই খিস্তিমাখা কলতলা, শায়া-শাড়ি ওড়া ছাত, কাক ছেটানো রাস্তা, মদের গন্ধ মাখানো সন্ধ্যে...

হ্যাঁ, ঐ হোটেলের ঘরে, মনে আছে, ও অ্যাটাচ্‌ড বাথ থেকে বেরিয়ে এসেছে, শায়াও নেই, আমাকে বলছে—অ্যাই, এ দিকে না, ওদিকে তাকাও...। আহা, একদম গৃহবধু। কীই বা দেখার আছে ওর। ওর মেয়ে রেখা তখন লাইনে নেমে গেছে। হাত উঠিয়ে যখন বগলে পাউডার দিচ্ছিল, তখনও একটু আড়াল করার চেষ্টা। চন্দনেশ্বরের মন্দিরের সামনে রিকশা থেকে নেমে বলল— ইশ, তুমি কালকের রাতের পাজামাটা পরেই চলে এসেছ, তুমি আমার সঙ্গে মন্দিরের ভিতরে যেও না। তোমার কী কামনা আছে আমারে কও। মালতী ফিরে এসে মাথায় 'চন্নামিত্তির' দিয়ে বলেছিল—কইয়া আসলাম—ওর বুকে ভালোবাসার ফুলে যেন রং থাকে, যেন না শুকায়। মালতী যখন খুব সত্যি কথা বলতে চায়, তখন ওর মুখ

থেকে হট্ করে বাঙাল কথাই বেরিয়ে যায়—আমি দেখিছি। বলে রূপ যৌবন পাছা মাই কয়দিনের, আমি তো অনন্ত, শ্যাষ নাই, কও? সমুদ্দুরের কাছে এসে এ কী ডায়লগ দিচ্ছে মালতী, এরকম আরও ফিলজফি মার্কা কথা বলে মালতী। বলে আকাশ নামে কিছু নাই, কিন্তু আকাশের মালিক আছে। বলেছে খেজুরগাছের কাঁটায় খেজুরগাছের কষ্ট নাই, কিংবা, দেখো কোনো কাঁটা গাছের চারাতেই কাঁটা থাকে না। বলে জীবনে এতগুলি ব্যাটাছেলেকে বসালাম, কে জানে ক'শো, ক'হাজার হবে, সবাই আলাদা আলাদা, তফাৎ আছেই, কিন্তু শেফালি ফুল ব্যাবাকগুলি একরকম। একদম এক। নিজের অসভ্য জায়গাটায় হাত দিয়ে বলে এইডা আর শেফালি ফুল এক রকম। রাইতের জীবন। সকালবেলায় শেফালিরা সব গাছের নীচে পালটি খেয়ে পড়ে থাকে—তাই না? মালতী লেখাপড়া করেনি। ইস্কুলে যায়নি। ও যখন লাইনে নেমেছিল তখন জওহরলাল নেহরু বুকে লাল গোলাপ লাগিয়ে দেশের উন্নতির কথা বলতেন, চাউমিন কেউ চিনত না, আর যৌনকর্মী শব্দটাও চালু হয়নি। স্রেফ খানকি। ভালো ভাষায় বেশ্যা। তো এখনকার মতো যৌনকর্মীদের সন্তানদের জন্য ইস্কুল ছিল না, এখন তো দশ নম্বরের ছাতেই ইস্কুল। চশমা পরা দিদিমণিরা সব পড়ায়, গান শেখায়, নাচ শেখায়। আর অ এ অজগর আসছে তেড়ে, আ এ আমটি আমি খাব পেড়ে—এরকম পড়ায় না। অ এ অন্ধকারে সবই কালো, আ এ আলো দেখা যাচ্ছে ভালো। রেখার মেয়েটা কি আলো আর অন্ধকারের তফাৎ বুঝবে? হিরো আর ভিলেনকে আলাদা ভাবে দেখতে পাবে?

রেখাটা একটু বুদ্ধু। ওর পেটে যখন বাচ্চা এসে গিয়েছিল মালতী বলেছিল নষ্ট করে দিতে। আরে তুই কি জানিস কার বাচ্চা, তুই কি বাবু রেখে ভেবে-চিন্তে করেছিলি? তা-তো করিসনি। উলটোপালটা কার না কার বাচ্চা পেটে নিয়েছিস।

মালতীর কিন্তু বাবু ছিল। রেখার যে বাপ, সে নাকি খুব সুন্দর দেখতে ছিল, কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, মালতী বলত রেখা ওর বাপের কিছুই পায়নি।

রেখার জন্মের আগেই ওই বাবু ফুটে যায়। এর অনেক পরে আমি যাই। আমি ঠিক মালতীর বাবু নই। কখনও বাবু মনে করিনি নিজেকে। মালতী তো আমাকে অন্য ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে ওর ঘরে লোক বসাত। কেন বসাবে না, আমি কি ওর পুরো লোড নিতে পারতাম? চানাচুরের ছোট্ট কারবার, সবসময়েই টিমটিম করছে।

ওই বাবুকে দেখিয়েছিল মালতী। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। সেই দীঘাতেই। একটা মারুতি ভ্যান থেকে নামছে একটা লোক, পাজামা পাঞ্জাবি। সাদা গোঁপ, মালতী হঠাৎ আমার হাতটা খামছে ধরল, বলল—ওই যে, রেখার বাপ।

বছর পঁচিশ পরে মালতী দেখছে ওর মেয়ের জন্মদাতাকে। হাত দশেক দূরে দাঁড়িয়ে। আমি বললাম সত্যি?

ও বলল—ভুল করিনি।

আমি বললাম—কোথায় কোঁকড়া চুল, মাথায় তো টাক দেখছি।

ও বলল—উঠে গেছে।

মালতী হাঁ করে দেখছে। স্মৃতি আসছে ডুব সাঁতার মেরে, আর খাবি খাচ্ছে অভিমান-টভিমান। ওই বুড়ো তখন হাত বাড়িয়েছে জিনস-গেঞ্জি পরা গলায় সোনার চেন, একটি ছেলের দিকে, ছেলেটা বুড়োকে নামিয়ে নিচ্ছে গাড়ি থেকে। কে হবে, জামাই বুঝি? শালোয়ার কামিজ পরা মেয়েটা, কোলে ছেলে, মেয়েটা নিশ্চয়ই পুত্রবধূ। পুত্র কই, পুত্র? পাজামা-পাঞ্জাবি পরা, ভালো ছেলে ভালো ছেলে দেখতে, ওটা? সুড়ঢাটা একবার এদিকে তাকিয়েই মুখটা ঘুরিয়ে নিল। মালতী ইচ্ছে করলেই তক্ষুনি ওর গ্রাভিটি বিলা করে, প্রেস্টিজ ঝোলে-ভাতে করে দিতে পারত। শুধু যদি বলত কী গো, কেমন আছ?—বলতেই পারত, ইচ্ছে কি করছিল না শরীরের খবরটা একবার জেনে নেবার, যে শরীরটার অনেকটাই মালতী জানে। কিন্তু মালতী আমার হাত ধরে পিছনের দিকে টানল, বলল—সুখে থাকুক গে যাক। কিন্তু সমুদ্র থেকে আসা আঁশগন্ধ বাতাসে দীর্ঘশ্বাসও মিশল একটা। দীঘা-টীঘার বাতাসে এরকম দীর্ঘশ্বাস অনেক থাকে।

একবার কালীঘাট গেছলুম। মন্দিরে। মালতী খুব বায়নাক্কা করছিল। আমি যদিও কালীকে খুব মানি, কিন্তু মন্দিরে যাই না। আমার বুকের ভিতরেই মন্দির। ১লা বৈশাখ নতুন খাতা কালী মায়ের পায়ে ছোঁয়াতে হয়। আমি আমার খাতা আমার নিজের মায়ের পায়ে ছুঁইয়ে বলি মা গো। আমার কোম্পানির চানাচুরে যেন ঠিকমতো কাজু বাদামের পার্সেন্টেজ ঠিক রাখতে পারি। সে যাই হোক, ওটা আমার পার্সোনাল ব্যাপার। মালতী অনেকদিন ধরে বলছিল, তাই আমি বললুম চলো। যে ওড়িয়া বামুনটি সকাল বেলা ওদের ঘরে গঙ্গার জল ছেটাতে আসে, ও নাকি পঞ্জিকা দেখে কি একটা শুভদিন ফিট করে দিয়েছিল। আষাঢ় মাসের কি যেন। বৃষ্টি হচ্ছে। একটা ট্যাক্সি নিলুম। মালতী একটা গরদের লাল পাড় শাড়ি পরেছিল, কপালে সিঁদুর অনেকটা। সকালে কিছু খায়নি। ময়দানের সাইড দিয়ে ট্যাক্সি চলছে, কাঁচের গায়ে বৃষ্টির ফোটা। মালতী বলল কিরকম গেরস্ত গেরস্ত লাগছে গো, তোমার লাগছে না? আমি তখন মালতীর শাড়ির পাড়টা ধরি। ন্যাপথালিনের গন্ধ। লাল পাড়ে হাত বুলিয়ে বলি হ্যাঁ। লাগছে। বলি এটা তোমার শাড়ি? মালতি বল্লে না, চাওয়া। কালী মন্দিরে যেতে আমারও মন্দ লাগছিল না। তীর্থ। কলিতীর্থ কালীঘাট। এটাই বোধ হয় গোবিন্দপুর ছিল। এই গড়ের মাঠ ছিল জঙ্গল।

জঙ্গলের ভিতর দিয়ে কালীঘাট যাবার রাস্তা। বাবা বলেছিলেন। যখন কালির কারবার তুলে দিয়ে ন্যাপথালিনের কারবার শুরু হয়, মায়ের ফুল নিতে বাবার সঙ্গে এসেছিলাম। মেজদা ছিল। বাবা বলেছিলেন বেনেদের কোনো পূর্বপুরুষ তাঁদের গোবিন্দ ঠাকুরকে নিয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করে বসত গড়েছিলেন, সেই থেকে গোবিন্দপুর। এখানে ওদের ভালো লাগল না তাই লাল দিঘির কাছে চলে যান। গোবিন্দপুর নামটা রয়ে যায়। এখানে এখন জমির দর কত? কতলাখ করে কাঠা?

কালীমন্দিরের সামনে দেখলুম পার্কিং-এ আমাদের গাড়িটা। মেজদার গাড়ি। বিমল মল্লিক মহাশয়। মেজদা মন্দিরে এসেছে বুঝি? আমাদের দেখে ফেলবে। দেখুক গে যাক। আমরা মন্দিরের দিকে এগুই। পাণ্ডারা ধরে।

একটা পাণ্ডা মালতীকে টুপি পরিয়ে নিয়ে চলল। আমি কিছু বললুম না। আজ তো মালতীরই দিন। ওর গরদের কাপড়ে ফড়ফড় করে সতী-গেরস্ত শব্দ হচ্ছে। পাণ্ডা একটা প্যাঁড়ার দোকানে নিয়ে গেল। আমারই সামনে মেজদা আর বৌদি। পুজোর ডালা কিনছে। কপালে লাল তিলক কাটা মেজদার পাণ্ডা মেজদাকে জিজ্ঞাসা করল কত টাকার ডালা? মেজদা বলল পঞ্চাশ টাকা। তারপরই মালতীর পাণ্ডা মালতীকে জিজ্ঞাসা করল। আমি তখন ইনটারফেয়ার করে বলি একশো টাকার। একশো। মেজদা বোধ হয় আমার গলার স্বর চিনে পেছনে তাকাল।

দেখেই কপাল কুঁচকে বলল—তুই? বলেই ছিটকে গেল। আমি বলি কেন, আসতে নেই নাকি?

মালতী ডালা ধরে আছে, গরদের শাড়ি, লাল পাড়, কপালে সিঁদুর। ওর এই রূপ আমি জিন্দেগিতে দেখিনি। মালতীর ওই পোস্টার আমার মনের দেয়ালে বহুদিন ভেবিকলে সাঁটা ছিল। মালতী বলল গঙ্গায় যাব। ওই নোংরা জল মাথায় ছেটালো। আমার গায়েও। আমি বলি আমি পুরো পবিত্রপাপী। জল ছিটিয়ে কী হবে? পুজোটুজো দিয়ে ডালাটা আমার হাতে দিল। ডালার ওপরে পান্নালাল ভট্চার্য্যের শ্যামাসঙ্গীতের গণ্ডাখানেক লাল জবা বলছে 'বলরে শিবু বল'। মালতীর মুখেও পদ্মফুল ফুটেছে। মালতী বলল দাঁড়াও, মানসিকের ঢেলা বাঁধি। লাল সুতো দিয়ে ঢিল বেঁধেছিল মালতী। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলুম তিনটে ঢিল বাঁধলে মালতী, তোমার কি তিনটে মনস্কামনা? মালতী বলল তিনটে মনস্কামনা নয়গো, তিনজনের ভালোর জন্য বললাম। আমি বলি কে তিন জন? মালতীর বয়স তখন অনেক কম। ও চোখের কারুকাজ করে বলল বলো তো এই তিন জন কে? কে?

আমি বলি এতো সোজা কোয়েশ্চেন। তুমি, আমি, রেখা।

মালতী বলল হল না। একজন মিলল না।

একজন মিলল না? কে সেই একজন? আমি ভাবি। আমার জন্য নিশ্চয়ই একটা ঢিল বাঁধবে মালতী। আমি শিওর। রেখার জন্যও বাঁধবে।

তবে কি ওর নিজের বদলে অন্য কারুর জন্য বেঁধে ছিল? বলো না কার জন্য বলো না কার জন্য করতে থাকলে মালতী বলেছিল—ওই রেখার মুখপোড়া বাপের জন্য।

ওই শালা জানতেই পারল না কালীঘাটের মন্দিরে একটা ঢিল ঝুলতে ঝুলতে বলে যাচ্ছে ভালো থাকো ভালো থাকো...।

সে যাক্‌গে যাক। আসল কথাটা হচ্ছে ওই একশো টাকার প্যাঁড়া প্রসাদ নিয়ে ও বাড়িতে সেবার খুব হইচই হয়েছিল।

মাঝেমঝে চানাচুর নিয়ে যাই ওখানে। চানাচুর নিয়ে গেলে খুব হই-হল্লা হয়। টিনের মধ্যে এখনও হাফ কেজি মতো আছে বোধ হয়। সুধীর, বুচু, ওরা মাল খেতে বাড়িতে আসবে বলে তুলে রেখেছিলাম দিন পনেরো আগে। সুধীরের স্ট্রোক হল সেদিন সকালে। এই তো জীবন। বিকেলে মাল খাবার প্ল্যান, সকালেই খরচা। এমনি ভাবেই আমারও হিসেব হয়ে যাবে শিগগির, আমি জানি। বাপের মতো আমার সুগার হয়েছে। এখন হাফ ডাইবিনিজ খেয়েও দুশো। হার্টের একটা ছোটো অ্যাটাক হয়ে গেছে। হাত পা ফোলে। ডাক্তার বলেছে কিডনির অবস্থা ভালো নয়। হয়তো কারুর সঙ্গে দেখা হল, জিজ্ঞাসা করল—শরীর কেমন! সব বললুম, শুনে টুনে হাত নাড়িয়ে বলে, আচ্ছা তাহলে ভালো থাকবেন। বোঝ। ইচ্ছে করে এক লাথ মারি। ভালো থাকবেন। তো, চানাচুর কি এখনও ভালো আছে? মিইয়ে গেলেও বাচ্চাগুলো মজা করে। ওরা অত বোঝে না। আমি যখন চানাচুর বিলোই, তখন বেশ গান করি। বানিয়ে বানিয়ে। শিবুবাবুর চানাচুর। মুখে পুর মুখে পুর। কিংবা ধনধান্যপুষ্পভরার সুরে— এমন স্বাদটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি সকল খাদ্যের সেরা হল শিবুর চানাচুর। ওগো শিবুর চানাচুর। মিলত না, না মিলুক গে আনন্দ তো কম হয় না। ভল্টা, গুটগুটি, শংকরী, গেঁজু, সবাই জড়ো হয়, শুধু ওই অন্ধ মেয়েটা আসতে পারে না, ওকে হাতে করে দিয়ে এলে ও হাত বাড়িয়ে আমাকেও ধরে। লাউগাছের আঁকশির মতো। চানাচুরের চেয়ে আমার হাতটাই ওর কাছে

ইয়ে। চানাচুরের মধ্যে দু-একটা কাজুবাদাম থাকে। আমি আলাদা করে বেছে ওর মুখে গুঁজে দিই। দিনে দিনে কাজুবাদাম কমছে। দশবছর আগে কেজিতে একশো থাকত, এখন দশ কেজিতে আড়াইশো থাকে। একদম উঠিয়ে দিতে পারছি না। কোম্পানির নাম হয়েছিল তো। লোকে জানত মল্লিকের চানাচুরে কাজু-কিসমিস থাকে। ডেলি এক মণ মাল তৈরি হত এক সময়। পিওর ছোলার ডাল, এক দানাও খেসারি মেশাইনি কোনোদিন। বেসন মেখে কারখানায় ঝুরিভাজা বানিয়েছি। বাদাম তেলে ভাজতুম, এখন বাদামে পারি না, রাইস অয়েলে ভাজি। বাবা চানাচুরের কারবারে রমরমা কিছুদিন দেখে গেছলেন। বলেওছিলেন কারবার তো ভালোই করছে, বিয়ে সাদি দিলে হয়। নেতাজির জন্মদিনে পাড়ায় চানাচুরের বৃষ্টি ঝরাতুম। সে একটা দিন গেছে। এখন ডেলি দশ কেজি মালও হয় না। বারোজন কারিগর ছিল। এখন তিনজনে *ঠেকেছে*। মাল চলে না। শালা কতরকম কোম্পানি হয়েছে, প্যাকিং-এর বাহার কী। সব হলদিরাম খোঁজে। আমার কোম্পানি এখন লাটে। যেমন দুলালের সাইকেল। ও বাচ্চাদের তিন চাকার সাইকেল বানাত, ঠেলাগাড়ি বানাত, ইংরেজিতে বলে প্র্যাম। এখন সব দিল্লির মাল। ছোটো কোম্পানিগুলি এভাবেই পটল তুলছে।

চানাচুরের কথা বলছিলাম। বারো চোদ্দো রকম মশলা ভেজে গুঁড়ো করা হত। এখন ওসব ঝামেলায় যাই না। বৈঠকখানা বাজার থেকে এখন রেডিমেড চানাচুর মশলা কিনে নিয়ে আসা হয়। যখন 'এ-ক্লাশ' চানাচুর ছিল, তখন রেকাবি করে বাবা-মায়ের ছবির সামনে দুটো করে রাখতুম। মেজদা একদিন বলল এসব কী হচ্ছে শিবু? বাবা-মার সঙ্গে ইয়ার্কি ফাজলামো এখানে চলবে না। আমি বললুম হুকুম নাকি? আমার কোম্পানির চানাচুর বাবা-মাকে দিয়ে পেসাদ করাচ্ছি, বেশ করছি। বাতাসা-নকুলদানার চে চানাচুর ঢের ভালো। আমি একদম স্টেটকাট বলে দি।

বাড়িতে আমি মাঝে মাঝে ওদের নিয়ে আসি। মালতী এসেছে। রেখা এসেছে, এছাড়া ও-পাড়ার আরও কেউ কেউ এসেছে। আমি ওদের বাড়ি

যাচ্ছি, ওরা আমার বাড়ি আসবে না? কেন আসবে না? আমি ওদের ডেকে এনে হইচই করি। শীতকালে কড়াইশুঁটির কচুরি করতে বলি, মালতী এসে করে, সবাইকে খাওয়াই। মাঝে মাঝে মালতীকেও সক্কাল সক্কাল নিয়ে এসেছি বাড়িতে, বলেছি তুমি রান্না করো, আমি খাই। আমি বাজার যাব। বাজার থেকে ফিরে রুটি আলুচচ্চড়ি খাব। আমি বাজার থেকে ইচ্ছে করে পচা মাছ নিয়ে আসি। মাছ ভাজার সময় খারাপ গন্ধ বেরোয়। পচা গন্ধ সারা বাড়িতে ছড়িয়ে যায়। মালতী বলে একটু বেশি করে রসুন চাপা দিতে হবে, নইলে খাওয়া যাবে না। ব্যস? হয়ে গেল? এটুকু? আমি যে মনে মনে চেয়েছিলাম ও আমাকে খুব বকবে। ঘরের বৌরা যেমন বকে। আমি তখন মালতীকে জড়িয়ে ধরে বলি—তুমি আমার সঙ্গে একটু ঝগড়া করো মালতী, বাড়ির বৌরা যেমনধারা ঝগড়া করে। তুমি একটু মুখ করো, আমি সুখ করি। ও আমার থুতনি ধরে বলেছিল ম-রণ। কতদিন পর বলল মরণ। সেটাও হেভি লাগল। মরণ রে তুহু মম শ্যাম সমান—একটা গান আছে। রেডিও-তে হয়। রেডিওটাই আমি বেশি শুনি। তা ওই মরণ শব্দটা শুনেই ওর মুখে চুমু খাই, তখন সারা বাড়ি পচা মাছের গন্ধে ভরে গেছে। গন্ধের কারণ খুঁজতে আমার ভ্রাতৃবধূরা আমার ঘরের সামনে এসে দেখেছিল আমার আর মালতীর ওই মরণ-মরণ সিন। তারপরেই বাড়িতে গুঞ্জন। একদিন মেজদা বলল—সেজো, তোর সঙ্গে কথা আছে। কুটুও হাজির। দুলাল ছিল না মেজদা আমায় বললে, দ্যাখ সেজো, বাড়িতে প্রস্ ঢোকাচ্ছিস, এ নিয়ে অনেক কথা হয়েছে, শুনিসনি, বাবার কথাও কানে তুলিসনি। অথচ বাবার ছবিতে ধূপ দিচ্ছিস, ফুল দিচ্ছিস। এখন বাড়াবাড়ি শুরু করেছিস। দরজা খোলা রেখে এইসব করছিস। আমাদের বাচ্চারা বড়ো হচ্ছে। আমাদের প্রেস্টিজ বলতে আর কিছু রইল না।

আমি বললুম, দেখো মেজদা, আমায় জ্ঞান দিচ্ছ। তুমি পঁয়ত্রিশ বছর আগে বিয়ে করেছ। জীবনে মিনিমাম পাঁচ হাজার বার করেছ, মানছি পরে তোমার ডাইবিটিস হয়েছিল, তা-ও তিন হাজার বার করোনি কি? আর এই ছোটো, তুইও ডেপুটেশন নিয়ে এসেছিস। তোর নয় নিউ বউ, কিন্তু তুই

বাড়িতে থাকলেই তোর ঘরের দরজা বন্ধ। দিনে দুপুরেও। আমি শালা লাইফে কিছুই পেলাম না, তোমরা আমায় এখন গীতা শোনাচ্ছ? তোমরা কি ভেবেছ আমার কিছু নেই? কিছু নেই এর ভিতরে? তখন ফ্যারফ্যার করে ছিঁড়ে গেল গেঞ্জিটা। আমি হনুমানের মতো বুক চিরে দেখাতে গেছিলাম। পুরনো গেঞ্জিটা এত স্ট্রেন সহ্য করবে কেন?

তখন কুটু বলল নাটক হচ্ছে নাটক!—মেজদা বলল—যা করবি ঘরের দরজা ভেজিয়ে করবি, না হলে উঠে যা এখান থেকে। অন্য জায়গায় গিয়ে যা খুশি কর, আমরা অন্তত কিছু বলতে যাব না। তখন হি হি হি হাসির শব্দ সবাইকে ভাগিয়ে দিয়েছিল। দুলালের পাগলী বউ। দুলালের বউটা অনেক খুচরো কারণে হেসে ওঠে। আবার খুচরো কারণেও কাঁদে। আমি রাতে শোবার অগে মাঝে মাঝে ক্যাসেট চালাই। ক্যাসেট শেষ হয়ে গেলে নিজেই বন্ধ হয়ে যায়। একদিন হাট্টিমাটিমটিম তারা মাঠে পাড়ে ডিম চালিয়েছি, ঘরের সামনে শুনি কান্নার শব্দ। দুলালের বউটা আমার ঘরের সামনে বসে ছোটোদের গান, ছোটোদের গান বলে কাঁদছে। একদিন দেখি বারান্দার দেয়ালে রঙিন খড়ি দিয়ে আঁকা একটা আঁকাবাঁকা দাগের সামনে বসে পাগলীটা কাঁদছে। বলছে দুগ্‌গা ঠাকুর ভেসে গেল। ওটা কি দুর্গা ঠাকুর নাকি। ভালো করে লক্ষ করে দেখি তাই তো, ছবিটায় গোল মুণ্ডু। টানা টানা চোখ, মুণ্ডুতে মুকুটের মতো, বডি থেকে দুপাশে অনেকগুলো দাগ। হাত বলে ভাবা যায়। গুণে দেখি বারোটার মতো। যে ছেলেটা এঁকেছে—ও কি দশ অবধি ঠিকমতো গুনতে পারে? অনেকগুলো হাত এঁকেছে। যেন শোয়ানো। বিসর্জন হচ্ছে।

এতো আমার স্পন্‌সর করা আর্টিস্ট পচা কিংবা শংকরি এঁকেছে। আমি তো নিয়ে আসি ও-পাড়ার বাচ্চাগুলোকে। হাতে চকখড়ি ধরিয়ে দিয়ে বলি নে, ছবি আঁক, আমাদের সারা দেয়ালে আঁক। যা মন চায়। চানাচুর দোব। কাগের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং এঁকে ভরিয়ে দে। সারা বাড়ি আর্ট এগজিবিশন করে দে।

ওদের আঁকা ছবি অনেক আছে এ-বাড়িতে। মেজদা টেজদা বলতে এলে আমি বলি ওরা আমার দোতলায় করেছে। তোমাদের ফ্লোরে তো করেনি। আমার ফ্লোর আমি ডেকরেশন করিয়েছি সেটা আমার ব্যাপার।

যেমন ভাগে পাওয়া আমার ফ্লোরে সিঁড়ির বাঁকে চলটা ওঠা চুনবালিতে ভোঁতা পেরেক আমি 'ভ' লিখে রেখেছি। ভ এ ভয় না ভালোবাসা সেটা আমি বুঝব। কিন্তু ওই 'ভ' আমার, ভয়ও আমার, ভালোবাসাও আমার। এর ওপর কোনো একদিন হয়তো নতুন চুনবালি পড়বে। প্লাস্টার অফ প্যারিসও পড়তে পারে। খুব মসৃণ হয়ে যাবে এই চুনখসা দেয়াল, মোলাম। ওই খোদাই করা 'ভ' মুছে যাবে। তাই বলে আমার এই খোদাই মিথ্যে নয়। মালতী, শোন, তোকে বলি, বাংলা স্যার ইস্কুলে বলেছিল—কে একটা লোক দেড় হাজার বছর আগে কোন পাহাড়ে লিখে রেখেছিল সুতনুকা নামের কোনো এক দেবদাসীকে সে ভালোবাসে। দেড় হাজার বছরের পুরনো ভাষায়। বাংলা ভাষারও আগের। সেই ভালোবাসা খোদাই করা পাথর থেকেই বাংলা ভাষার জন্মবৃত্তান্ত জানা গেছে।

আর এই দেয়াল-টেয়াল? বিসর্জনের ছবিটা? ভূতের ছবি? রসগোল্লার ছবি? এগুলোর ওপর যদি প্লাস্টিক পেইন্ট চাপে কোনো দিন, ইতিহাস মুছে যাবে? পচাটা তো প্রথম দিন ভয়েই একসা, কিছুতেই দেয়ালে কিছু লিখবে না। আমি বললুম, আঁক, না আঁকলে প্যাঁদাবো, আঁকলে জিলিপি দেব। ছেলেটা এঁকেছিল দুটো গোল গোল। আমার ঘরে। ওগুলো নাকি রসগোল্লা। ওকে ক্যাডবেরি দিয়েছিলুম। ওর ক্যাডবেরি পছন্দ হয়নি। বলেছিল জিলিপি কই, জিলিপি? ছেলেটার মা নেই। হেপাটাইটিস হয়ে মরেছিল। ছেলেটা চম্পার কাছে থাকে। আর যে ছেলেটা দুর্গার বিসর্জন এঁকেছিল ও তো প্রাইজ পায়। ওই যে জবালা ক্লাব না কি যেন বলে, যারা বেবুশ্যেদের যৌনকর্মী বলে, ওরা মাঝে মাঝে ওদের বাচ্চাদের নিয়ে গান-বাজনা করে, ছবি আঁকার কম্পিটিশন করে। বাচ্চাদের নিয়ে চিড়িয়াখানা বেড়াতে যায়। আমি কোনো ক্লাব না। আমি শালা কারুর পরোয়া করি না। আমার নিজের ঘরেই আর্ট গ্যালারি বানিয়ে দিয়েছি। আমি

শালা আমার কোনো কার্বন কপি না রেখেই ঝপ্ করে মরে যাব। শিগগিরই হয়তো মরব। আর বাঁচতেও চাই না। দুনিয়া অনেক দেখলুম, টিভির নাচের মতো সেম জিনিস। সেম রিল রোজ চালাচ্ছে। আর ইন্টারেস্ট নেই। মালতী তবু একটা জোর করে মাদুলি গছিয়ে দিয়েছে। সোনাগাছিতে কোন পীর আসে মাজারের। মাজার মানে পীর সোনাগাজীর মাজার। ওর থেকেই সোনাগাছি নাম হয়েছে। মালতী আমার বুকের মাঝখানে মাঝেমাঝে হাত দিয়ে দেখে—মাদুলিটা ঠিক আছে কিনা। মালতী বলে মাদুলির চাইতে বুকের ধুকপুকিটা পেতেই ওর বেশি ভালো লাগে। ওখানকার এক দালালের বাড়ি দেওঘর। ওখানকার অর্জুন গাছের গল্প শুনেছে মালতী লোকটার কাছে, মালতী লোকটাকে দিয়ে অর্জুনের ছাল আনিয়েছে। অর্জুনের ছাল ভিজানো জল নাকি হার্টের পক্ষে ভালো। আমার ছাই এসব মনে থাকে না। সের দুয়েক অর্জুনছাল আমার ঘরের কোণায় পড়ে আছে। ধুর, ওসব ভিজোতে মনে থাকে নাকি? মেজবৌদিকে কিংবা কুটুর বউকে হার্গিস বলব না। দুলালের বউকে একবার এক খাবলা দিয়েছিলাম, দেখবার জন্য, কতটা পাগলী। বলেছিলাম রোজ রাত্তিরে জলে ভিজিয়ে এক গেলাশ দিও। গত এক বছরে একদিনই দিয়েছিল, হঠাৎ।

দুলালের বউটার কিন্তু গান করার ইচ্ছেটা দারুণ। আমি যখন মাঝে মাঝে জোরে গান করি, আমি ডুয়েট শুনি, ও দূর থেকে গেয়ে ওঠে। কিন্তু গলায় সুর নেই। ওর প্রিয় গান হল—'নিঝুম সন্ধ্যায় ক্লান্ত পাখিরা বুঝিবা পথ ভুলে যায়', অন্য গানও ওই সুরে করে। 'দে মা আমার তবিল্‌দারী' কিংবা 'পুরনো সেই দিনের কথা'-কে ওই সুরে ম্যানেজ করা চাট্টিখানি কথা নয়।

দুলালের মাথাটা হল ফ্রি সাইজ। সব রকম টুপি লেগে যায়। বন্ধুরা টুপি পরিয়েছে, পার্টি টুপি পরিয়েছে, ওর কারবারের লোকগুলো টুপি পরিয়েছে, ওর শ্বশুরবাড়ি টুপি পরাল একটা পাগলি মেয়ে গছিয়ে দিয়ে। সত্যি বলতে কি, আমিও টুপি পরিয়েছি ওকে। লাস্ট টুপি, যেটা দুলালকে পরিয়েছি সেটা হল একটা প্র্যাম। একটা প্যারাম্বুলেটার চেয়ে নিয়েছি। ও

জিজ্ঞাসা করেনি কার জন্য, কী বৃত্তান্ত। আমি ওটা রেখার মেয়ে সুকন্যার জন্য নিয়েছি। ওই দশ নম্বর বাড়িতে প্রথম এরকম গাড়ি এল বাচ্চাদের জন্য। কোথায় ঠেলবে? বারান্দা যা ছিল, তার মধ্যে নতুন নতুন খুপরি হয়েছে। ছাতেও উপায় নেই। একদিন দেখি ওর প্র্যামের ভিতর বরফে ডোবানো থাম্‌স্ আপ। একজন ওই শখের প্র্যাম ঠেলে এ ঘর থেকে ও ঘরে যাচ্ছে। বাবুদের থামস্ আপ লাগবে কিনা জিজ্ঞাসা করছে। আমার খুব ইচ্ছে হল—একদিন বাচ্চাটাকে রাস্তা ঘোরাই। ও তো দেখবে না কিছু, ভেরিয়াস টাইপের গল্প মাখানো সোনাগাছির হাওয়া ওকে ছুঁয়ে যাবে। তেলে ভাজার গন্ধ মাখানো হাওয়া, সোনার দোকানের নাইট্রিক অ্যাসিড মাখানো হাওয়া, পীরের মাজারের ধূপকাঠির ধোঁয়া মেশানো হাওয়া, ঝুমঝুমি বা বাজানো বালক হাওয়া...

ওদের পুরুষানুক্রমে দাদু নেই। একদম মালতী থেকেই ধরি। মালতীর মা বাঙাল ঘরের মেয়ে। জিন্না-জওহরলাল গদিতে বসল বলে মালতীর মাকে বেবুশ্যে হতে হল। মালতীর বাপ লুঙ্গি আর টুপি পরেই আসছিল কিন্তু ধরা পড়ে গেল। মালতীর মা রেপড্ হবার পর আর স্বামীকে দেখেনি। মালতীর মেয়ে রেখা। সেও দাদুকে দেখেনি। রেখার মেয়েটাই প্রথম দাদু দেখছে। সেই দাদু আমি। বন্দেমাতরম। ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

দেখেছে কি? দেখতে তো পারছে না। মেয়েটার চোখটা তো ঘোলাটে হয়ে গেছে। ও যখন রেখার পেটে, তখন নাকি রেখার একটা গণ্ডগোল হয়েছিল। কী একটা নাম বলেছিল জবালার মেয়েগুলো। সবার যেমন চোখ হয়, সেরকমই চোখটা হয়েছিল। বছর খানেক বয়স থেকে বোঝা গেল কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে যখন হামাগুড়ি দিতে গিয়ে দেয়ালে ঠোক্কর খাচ্ছিল, যখন সামনে লাল বেলুন ধরলেও ধরতে এগুচ্ছিল না।

এখন চোখের ওপর একটা কেমন যেন পাতলা পর্দা পড়ে গেছে। কেউ বলছে সারবে, কেউ বলছে সারবে না। কেউ বলছে চেন্নাইতে নিয়ে গেলে সেরে যাবে, কেউ বলছে চণ্ডীগড় নিয়ে যেতে। নেবেই বা কি করে? খরচ কি কম? এই রেখাটা একটা পার্মানেন্ট বাবু ধরতে পারল না। ঠিকমতো

একটা বাবু ধরা থাকলে খরচা দিয়ে দিত। এখন অনেক জায়গায় শুনি বাংলার কালচার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এখানেও, এই সোনাগাছিতেও বাংলা কালচারের আদর নেই। আগ্রা থেকে যেসব মেয়েরা আসে, ওরা দিব্যি বাবু পেয়ে যায়। প্রোমোটার বাবু, কন্ট্রাক্টার বাবু, ট্রান্সপোর্টের বিজনেস করা বাবু, এইসব বাবুরা খুব শাঁসালো হয়। আর এইসব বাবুদের যাবতীয় কেপ্‌ট আগ্রাই, যোধপুরী, এলাহাবাদী। ঠিক আছে, কোই বাত নেই, যদি চেন্নাই নিতেই হয়, কিংবা অন্য কোথাও নিতে হয়, তবে যা লাগবে আমিই দেব। চানাচুরে কাজুর কুচি বন্ধ করে দেব, আমার নিজের ওষুধ বন্ধ করে দেব। তবু শালা নিয়ে যাব। না নেবার কোনো মানে হয়? নাতনিকে দাদু দেখছে, নাতনির নাকের শিকনি দেখছে, আর নাতনি টাকসমেত পাকা গোঁপসমেত দাদুটাকে দেখবে না?

হে মা কালী, ডেলি পুজো করি তোকে। জবার মালা দি, অন্যদের মতো প্লাস্টিকের পার্মানেন্ট মালা নয়, শালপাতার ঠোঙায় কলাগাছের আঁশ দিয়ে বাঁধা জবার মালা। তেমন কিছু চাইনি তোর কাছে কোনোদিন। আজ ফার্স্টটাইম একটা জিনিস চাইছি, দেখি তোর কত এলেম। বাচ্চাটাকে চোখ ফিরিয়ে দে।

দে মা চোখের জ্যোতি খুলে
যদি ফেল করিস মা তবে
তোকে দিব গালি শালী বলে
অধম শিবু বলে যদি ভালো চাসতো
দে মা চোখের দৃষ্টি খুলে...

রাগ বেহাগ, তাল তেওট।

তিন

শিবুদা বমি করছে। অনেকক্ষণ ধরে বমির শব্দ পাচ্ছি। সকাল থেকেই মালঝাল খাচ্ছে নাকি? আর পারা যাচ্ছে না। বাচ্চাটা আর একটু বড়ো হলে বাঁচি। এই ঘর চাবি দিয়ে দেব। এই ঘরটা অ্যাকচুয়ালি গেস্ট রুম। অফিসিয়ালি, মানে অ্যাজ পার বাবার উইল, এটা গেস্ট রুম। আমি ক'দিনের জন্য দাদাদের কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছি। আর দোবই না। ফালতু সেজদার ভোগে গিয়ে লাভ কী? তা ছাড়া আমি তো ডেপ্রাইভ্‌ড। এই বাড়িটা তিনতলা। একতলায় গ্যারেজ আছে, আর তিনটে ঘর। গ্যারেজে মেজদার আর আমার গাড়ি থাকে। মেজদা তিনটে ঘর নিয়েই থাকে। দোতলায় সেজদার দুটো ঘর, দুটো গেস্ট রুম। গেস্ট কেউ আর আসে না। কে আসবে এই পাগলা গারদে? সেজদা দুটো ঘরের একটাকে ঠাকুরঘর বানিয়েছে, আর একটায় নিজে থাকে। থার্ড ঘরটা এখনও লক অ্যান্ড কী। চাবিটা আপাতত আমার কাছে। ফোর্থ ঘরে আপাতত আমি আছি। পূবটা খোলা, বাচ্চাটা রোদ পায়। বাচ্চাটার জন্যই মেইনলি, এই ঘরটা নেওয়া। তিন তলায় চারটে ঘর, দুটো আমার, দুটো ছোড়দার। আমার ঘর দুটোর একটাও ইস্ট ওপেন নয়। সকালের রোদটা আসে না। বাচ্চাটার পক্ষে সকালের রোদ্দুরটা খুব দরকার। তাই দোতলার ঘরটা নিয়েছি। মেজদার খুব লোভ ছিল, বলেছিল ওর একটা রেস্টরুম দরকার। দোতলা কখনও রেস্টরুম হতে পারে? দোতলাটা একটা প্যান্ডামনিয়াম। ব্রথেল থেকে হোরস্ আসে। ভাবা যায়? সত্যচাঁদের বংশধরদের এই অবস্থা। দোতলার দোষ দিচ্ছি কেন? তিনতলাটাও কী খুব ভালো নাকি? ওখানে রয়েছে একটা পাগলি। যখন তখন ঘরে ঢুকে পড়ে, বাচ্চাটাকে আদর করতে চায়। খুব রিস্কি। বড়ো মেয়েটা যখন হয়েছিল, নন্দিতা বাপের বাড়ি

ছিল। এক বছর যখন বয়স, তখন এসেছিল। একদিন দেখি সুকন্যা মিসিং। কোথাও নেই, তারপর দেখা গেল ছোড়দার পাগলি বউও মিসিং। খুঁজে পেতে দেখি ছাতের জলের ট্যাংকির পিছনে বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে বসে আছে, আর বলছে সুনুমুনু তোমায় আমি কোল থেকে ছাড়ব না। বড়ো হয়ে মা ডাকবি তো, আমাকে মা ডাকবি? ভয় পেয়ে নন্দিতা আবার বাপের বাড়ি চলে গেল।

মেয়েটার সঙ্গে ছেলেটার লং গ্যাপ। বহু বছর পরে ছেলেটা হল। এবার বাপের বাড়ি গেল না নন্দিতা। ওর মা মারা গেছেন, দেখবে কে। এখানেই আছে। আয়া রাখতে বলেছিলাম, কিছুদিন ছিল। কিন্তু আয়ার ঝামেলা অনেক। এমনি একটা মেয়ে আছে। তিন তলার তুলনায় দোতলায় বাচ্চটাকে রাখাই অনেক সেফ। পাগলিটা ঘন ঘন আসতে পারে না। আর এই ঘরে থাকলে আমরা খিল দিয়ে রাখি।

এভাবে আর থাকা যায় না। ফ্ল্যাটে উঠে যাব। এবার যাবই। ফ্ল্যাটটা কিনেছি ভি আই পি রোডে। ভাড়া দিয়ে রেখেছিলাম। দু'বছরের কন্ট্রাক্ট দি। আবার রিনিউ করি। একই ভাড়াটে আছে গত সাত বছর ধরে। দু'বার রিনিউ করেছে, ফিফটিন পার্সেন্ট ভাড়া বাড়িয়ে। থার্ডবারের বার বললাম আর রিনিউ করাতে চাই না, উঠে যাও। নোটিশ দিলাম। উঠছে না। বলছে ভাড়া বাড়িয়ে কন্ট্রাক্ট রিনিউ করে নিন। আমি তো বললাম ওদের, আরে ভাই ডাবল দিলেও আর দেব না। বাড়িতে আর পারছি না। বরং আপনাদের এক মাসের ভাড়া ধরে দিচ্ছি, উঠে যান। উঠছে না। জানি, মামলা করলে আমাদের ফেবারেই কেস যাবে, কিন্তু কিছুতেই কেস ফাইল করা হচ্ছে না। এবার আইদার কেস ফাইল করব না হয় পার্টি সোর্স লাগাব। যতদিন না হয়, অন্য ফ্ল্যাট ভাড়া করে থাকব। এখানে আর পারা যায় না।

আবার বমি করল। শব্দ আসে। দরজা বন্ধ থাকলেও শব্দ আসে। কাল রাত্রে অনেক মাল টেনে এসেছিল। সিঁড়িতেই পড়ে যাবার উপক্রম। কোনোরকমে ঘরের ভিতরে পৌঁছে খাটে নয়, মেঝেতেই...। আমি আওয়াজ পেয়ে ওর ঘরে গিয়ে দেখি সেজদা মেঝেতে পড়ে আছে। আমার

কি মনে হল, ঘরে গেলুম, ভাবলুম যা ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া হচ্ছে, মশারির বাইরে সারারাত পড়ে থাকবে, অসুখ-বিসুখ হলে তো আমাদেরই ঝামেলা। আমি খাটের মশারি নামিয়ে ওকে বিছানায় তোলার চেষ্টা করি। সেজদা জড়ানো গলায় বলতে থাকে আমি মেঝেতেই পড়ে থাকব। আমার মেয়ে রেখা সুইসাইড করেছে, জানিস? আমার খাটে শুতে নেই। আমার অশৌচ চলছে। কেন সুইসাইড করেছে জানিস? ডাক্তাররা জবাব দিয়ে দিয়েছে। রেখা যখন শুনল রেখার মেয়ের চোখটা আর ভালো হবে না, অমনি বাড়ি এসে গলায় দড়ি দিল। সেজদা বকেই চলেছে—আজ গেছলুম খবর নিতে। গিয়ে দেখি বাড়ির সামনে জটলা। রেখার গলায় দড়ি। ওর বাচ্চাটা কোনোদিন ওর মায়ের রূপ দেখতে পেল না।

আমার দিকে তাকিয়ে সেজদা বলল তোরা ইঞ্জিনিয়ার? লোমের ইঞ্জিনিয়ার। লোমের সাইন্স। কী পারে সাইন্স? শান্তি দিতে পারে?

সকালবেলায় দেখলাম সেজদা খাটেই শুয়ে আছে। মশারি খাটায়নি। কালকের বেশি মাল খাওয়ার রেজাল্ট। গ্যাসফ্যাস হয়ে গেছে বোধহয়। আমার চোখের সামনে আজকের রোববারের কাগজে ডিটেকটিভ গল্পটা। ডিটেকটিভ গল্প এভাবে পঁড়া যায় নাকি? টিভিটাও খোলা আছে। এক গাদা চ্যানেল। বাংলা চ্যানেলই কত। সেজদার আজ কিছু খাওয়া হয়নি। না খাওয়াই ভালো। পেটে গ্যাস অম্বল হলে স্রেফ জল। ছোড়দাটাও একবার আসতে পারত তো। ছোড়দা কি বমির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে না? কে জানে, এমনও হতে পারে, ছোড়দা এখন নেই। আমরা তো জানিই না কে কোথায় আছি, কে কোথায় যাই। কে কখন থাকি, কে কখন থাকি না। আজ পাঁঠার মাংস খেলাম দুপুরে। রেড মিট খাই না বললেই হয়। কিন্তু খেতে ইচ্ছে করে।

আমার চোখের সামনে ডিটেকটিভ গল্প খোলা, এক পাশে টিভি খোলা। নন্দিতা এখন অনেকটাই খোলা, দরজাটা খোলা নয়। বন্ধ।

নন্দিতা একটা দেশলাই কাঠি দিয়ে দাঁতে আটকে থাকা মাংস বার করছে কাঠি দিয়ে। মেয়েরা এসব করলে খুব বাজে লাগে। মেয়েদের কান

খোঁচানো, নাক খোঁটা, এসব বিচ্ছিরি। মেয়েরা যখন দাঁত ব্রাশ করে, ঠোঁটের কোণার ফেনা খুব আগলি লাগে। নন্দিতা এবার বগলে পাউডার দিচ্ছে।

আমার পুচকু বাচ্চাটা হাত-পা ছুঁড়ছে মিকি মাউসের ছবিওয়ালা তোয়ালের ওপরে। একটু আগে ঘুম থেকে উঠল। ছোটো বাচ্চাদের হাত-পা ছোড়া দেখতে হেবি লাগে। বাচ্চাটা হিসি করল মনে হয়। পা দুটো উঁচু করে দেখলাম হ্যাঁ, করেছে। তোয়ালে পালটে দিতে হবে। বেশ লাগে কিন্তু। আমিও এসব করি। শুধু নন্দিতাই করবে কেন। সুকন্যা যখন হয়েছিল, আমি নন্দিতাকে বলেছিলাম দেখো, তুমি কেন রোজ রোজ রাত জাগবে? অলটারনেটলি জাগি। সুকন্যা থাকত মাঝখানে। আমি বাঁহাত দিয়ে বুঝে নিতাম বাচ্চাটার কাঁথা ভিজেছে কিনা। ঘুমের মধ্যেও অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। তখন আমার ছিল অপারেশনাল ডিউটি। রাত্রে একদিন প্ল্যান্টে কী একটা মেজর ডিফেক্ট। আমি প্ল্যান্টে ছিলাম। চিফ ইঞ্জিনিয়ার অশোকদাও প্ল্যান্টে। ইউনিটটা সারিয়ে অপেক্ষা করছি।। ঠিকঠাক চলছে কিনা। রাত্রে কনফারেন্স রুমের কার্পেটের ওপর শুয়ে পড়েছি। অশোকদা আমার বাঁ পাশে। একটু পরে অশোকদা আমাকে ঠেলা দিয়ে বললেন—কী হচ্ছে কী? আমি ঘুমের ঘোরে কিছু বুঝিনি। পরদিন সকালে অশোকদা আমাকে বললেন ব্যাপারটা কী বলত মল্লিক! বারবার আমার কোথায় হাত দিচ্ছিলে? ছিঃ। তুমি হোমো নাকি?

ব্যাপারটা কী, কেন এরকম হয়েছিল বোঝাতে আমার অনেক কসরত হয়েছিল।

পা দুটো একটু উঁচু করে ওর হিসি-তোয়ালেটা টেনে নিলাম, ঘরের কোণায় ছুঁড়ে দিলাম। ওখানে আরও ভেজা-কাঁথা তোয়ালে আছে, আর ওখানে জমে আছে একটা গন্ধ। দেখি, ওখানে একটা প্রজাপতি ঘুরে বেড়াচ্ছে। ও কেন ঘুরঘুর করছে ওখানে? প্রজাপতিদের শৈশবে কি কাঁথা জড়ানো পেচ্ছাপ থাকে?

শিশুটা হাত পা ছুঁড়ছে। কেন আনন্দ? কী আনন্দ ওর এখন? একটা কাঁথা খুঁজতে থাকলাম। শুকনো। অনেক নরম নরম তোয়ালে রয়েছে, কিন্তু কাঁথা নেই। নন্দিতার মা কয়েকটা কাঁথা সেলাই করে দিয়েছিলেন মারা যাবার আগে। বাচ্চাটা হবার মাস খানেক আগে নন্দিতার মা মারা যান। ক্যান্সার। পাঁচটা কাঁথা দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। এখন তিনটে আছে। দুটো মিসিং। হারিয়ে গেছে হাওয়ায়। উড়ে টুড়ে গেছে ছাতের পাঁচিল থেকে।

কিন্তু নন্দিতার বক্তব্য হল হাওয়ায় উড়ে যেতেই পারে না। কোনো চান্স নেই। বাইরে মেলেইনি ও। সেদিন কাঁথা ধোয়ার বউটা আসেনি। ও দুপুর বেলা কাঁথাগুলো ধোয়, তারপর নিজেই মেলে দেয়। ও ধুতে নেবার সময়েই পায়নি কাঁথা দুটো। ও নাকি দেখেছে সেদিন সকালবেলাতেও কাঁথাদুটো ছিল। আমি শিওর এটা নন্দিতারই ক্যালাসনেস। নিশ্চয়ই মেলে দিয়েছিল। ছাতের পাঁচিল না হোক, বারান্দার রেলিং-এ। ক্লিপ আঁটেনি নিশ্চয়ই, নইলে পেচ্ছাপ মাখা ওইসব কাঁথা কে চুরি করতে আসবে? কাজের বউটা? ও তো চারটে বাচ্চার পর লাইগেশন করিয়েছে—তাও দু বছর হবে। ঘোড়ার মুখ, মানে নন্দিতার মুখ থেকেই পাওয়া এই খবর।

নন্দিতার মুখটা একটু লম্বাটে। তাই বলে ঘোড়ার মুখের মতো নয়। বেশ বুদ্ধিদীপ্ত মুখ। এমনি এমনি ফেঁসেছিলাম? বাঙাল বাড়ির মেয়ে। এম এ পাস হলে কী হবে, রাঁধে বেশ। ওর সবই ভালো। তবে বড্ড ঘেন্না ঘেন্না বাই। নিজের বাচ্চার গুয়ের কাঁথা নিজে ধোবে না। কখন কাজের মেয়েটা আসবে, ওই জন্য জমিয়ে রাখবে। কামাই করল তো কাচবেই না। গন্ধ হয়। তাই একটা ঢাকা দেওয়া প্লাস্টিকের বালতি কিনেছি। তবে হিসির কাঁথাগুলো কোনোরকমে কাচে। বমিটমি করলে বমি মোছার সময় ওর নাক কুঁচকে যায়। ঠোঁট উলটে যায়।

তো, ওই কাঁথা যেভাবেই হারাক, নন্দিতা খুব দুঃখ পেয়েছিল। ছোট্ট নন্দিতার যখন বছর তিনেক বয়স, তখন ওর মায়ের পরনে একটা হাতিছাপ শাড়ি দেখে বায়না করেছিল ওই শাড়িটা ও পরবে। ওর মা ওর গায়ে পেঁচিয়ে দিয়েছিলেন শাড়িটা। নন্দিতা নাকি সারাদিন পরেছিল শাড়িটা, কিছুতেই খুলতে দেবে না। রাত্রে ঘুমোলে ওর মা সরিয়ে দিয়েছিল ওই

শাড়ি। মাঝ রাত্তিরে নাকি নন্দিতা আমার হাতি কোথায় গেল বলে কেঁদে উঠেছিল। তখনই নন্দিতার মা ভেবেছিলেন নন্দিতার বাচ্চা হলে ওই শাড়ি দিয়ে কাঁথা সেলাই করে দেবেন। যত্ন করে রেখে দিয়েছিলেন। প্রথম বাচ্চা সুকন্যা হবার পর উনি বোধহয় ব্যাপারটা ভুলে গিয়েছিলেন। এরপর যখন ক্যান্সার ধরা পড়ল এবং উনি জানলেন ক্যান্সার হয়েছে, তখন চিন্তা করতে থাকলেন কী কী কাজ বাকি আছে এ জীবনে। তখনই হয়তো ওই হাতিছাপ শাড়িটার কথা মনে হয়েছিল। সেই শাড়িটা খুঁজে বার করে গোটা পাঁচেক কাঁথা তৈরি করেছিলেন। এখন তিনটে আছে, দুটো মিসিং।

সেজদা বমি করছে।

একটা নুইসেন্স। কাল রাত্রে তো একস্ট্রা ডোজ মাল খেয়েই ছিল। পরশুদিনও। পরশু রাত দেড়টা নাগাদ শ্যামাসঙ্গীত শুনেছিলাম। ওপরের ঘরে মেয়ে পড়ে টড়ে, ওখানেই থাকে নিজের মতো। আমরা এখন দোতলাতেই শুচ্ছি। রাত্তিরে কেব্‌ল-এ একটু অ্যাডালট্‌ পিকচার দেয়। দেখছি, এমন সময় শ্যামাসঙ্গীত শুনলাম। শোবার অগে একটু শ্যামাসঙ্গীতের অভ্যেস সেজদার। সাধারণত নিজেই গায়, যেদিন বেশি গেলা হয়ে যায় সেদিন পান্নালালের সঙ্গে কিশোরকুমার পান্‌চ হয়ে যায়। যেদিন সেটুকুও পারে না, সেদিন টেপটা অন্‌ করে শুয়ে পড়ে। মেশিনে ক্যাসেট ভরাই থাকে, ক্যাসেট শেষ হলে নিজেই বন্ধ হয়ে যায়। পরশু রাত্তিরে স্বখাত সলিলে ডুবে মরি দিয়ে শুরু হয়েছিল, ভল্যুমটা একটু বেশিই। 'মা গো আনন্দময়ী নিরানন্দ করো না'-র সময় আমি সেজদার ঘরের জানালা দরজা বন্ধ করে আসি।

আমার জানালার ওপাশেই সেজদার ঘরের জানালা, মাঝে একটা চার ফুটের বারান্দা। আমার ঘরে ফকির মিত্র লেন থেকে দু'এক ঝলক হাওয়া মাঝে মাঝে আসে, আমার ঘরের মধ্যেই একটু ঘুরঘুর করে মনখারাপ করে ফকির মিত্র লেনেই ফিরে যায় ফের। যদি আমার জানালাটা আর সেজদার জানালাটা একইসঙ্গে খোলা থাকে, তবে ফকির মিত্রর হাওয়া সেজদার ঘর হয়ে শঙ্কর হালদারের গলিতে চলে যেতে পারত।

বন্ধই করে রাখি। বন্ধ না করে উপায় কী। নেহাত বাড়িটা চেঞ্জ করতে পারছি না। ফ্ল্যাটে ভাড়াটা দিয়েই ভুল করেছি। ভেবেছিলাম যতদিন পারি থাকি। পুরনো পাড়া। ছোড়দা পার্টি করছে বলে পাড়ায় একটু হোলড্, তা ছাড়া শ্বশুরবাড়িটাও কাছে বাগবাজারের পশুপতি বোস লেন-এ। নন্দিতা পড়ত নিবেদিতা ইস্কুলে, পুজোর সময় আহেরিটোলা সার্বজনীন প্যান্ডেলে হিড়িক দিতে গিয়ে ওর সঙ্গে আলাপ। ও তখন সবে ক্লাস টেন। আমি ইঞ্জিনিয়ারিং।

সেজদা বমি করছে।

বারান্দার দিকের জানালাটা খুললাম। একটা মাকড়সার জাল ছিঁড়ে গেল। কোনো শব্দ হল না, কিন্তু সিনেমায় এরকম জাল ছিঁড়ে যাওয়া দেখাবার সময় সেতার সারেঙ্গি গিটারে একটি করুণ শব্দ তুলত। ইনফ্যাক্ট বহুদিন না খোলা জানালার মাকড়সার জালটা ছিঁড়বার সময় আমি ওরকম একটা শব্দ শুনলাম। জানালা খোলার পর জানালা দিয়ে বারান্দার ওপাশ দেখলাম। ওপাশকে ওপার মনে হল। সেজদার জানালা বন্ধ। জানালার সবুজ কাঠে ভূতের ছবি, সাদা চকখড়িতে। এইসব ভূতের ছবিটবি আঁকিয়েছিল সেজদাই। সিঁড়ির দেয়ালে, বারান্দায়, বোধহয় সেজদার ঘরের দেয়ালেও। সেজদা এ বাড়িতে কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে আসে। সেজদাকে সেবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম এদের জোগাড় করলে কোত্থেকে!

সেজদা সোজা বলেছিল—কেন? সোনাগাছি থেকে।

ভাবা যায়! আমি প্রথমে বিশ্বাস করিনি। পরে যখন জানলাম ব্যাপারটা সত্যি, তখন গাটা রিরি করে উঠেছিল। সেজদার নানারকম পাগলামি দেখেছি জীবনে। কিন্তু এরকম পাগলামির কোনো আইডিয়া ছিল না। একদিন দেখি একটা ছেলের হাতে চক দিয়ে বলছে—আঁক বেটা, যেমন খুশি আঁক, যা মন চায়, কাগের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং এঁকে ভরিয়ে দে। ছেলেটা ভয়ে সিঁটকে আছে। সেজদা বলছে না আঁকলে প্যাঁদাব। ছেলেটা দুটো গোল আঁকল। সেজদা বলল কী এঁকেছিস?

ছেলেটা বলল রসগোল্লা। অন্য দেয়ালে কয়েকটা আঁকাবাঁকা দাগ। সেজদার বন্ধ জানালায় ভূত। নাকি সেজদাকেই এঁকেছিল সে।

এই যে দেয়ালগুলো নোংরা করাল সেজদা, কিছু বললাম না। বললেই এমন এমন কথা বলতে শুরু করত, যা শোনা যায় না। আবার আমার তো বউ-বাচ্চা আছে, না-কি? কিংবা শুনলে মেজাজ ঠিক রাখা যায় না। আমার একটু হাইপ্রেসারের ধাত। এজন্য যতটা পারি চেষ্টা করি নিজেকে কুল রাখতে। ঝগড়াঝাটি অ্যাভয়েড করতে। হতে পারে সেটা সেজদার একটা টেকনিক। যাতে আমরা কিছু না বলতে পারি। খিস্তির প্রাবল্যটা লক্ষ করছি, বেড়েছে ইদানিং।

আমার বিয়ের আগে কিন্তু সেজদা আমাকে ভালোই বাসত। আমার মোটামোটা বই দেখে বলত তোর ডাম্বেলের কাজ চলে যাবে। অন্যদের ডেকে বলত আমার ছোট ভাই ইঞ্জিনিয়ারং পড়ে। সুবর্ণবণিক সমাজের পত্রিকায় আমার ছবি বার হয়নি বলে সম্পাদককে খিস্তি দিয়েছিল। আমার বিয়ের পর থেকেই ওর মধ্যে চেঞ্জ। ওর বিয়ের জন্য বাবা চেষ্টা করেননি। বাবাকে কিছু বলার সাহস নেই। আমার ওপর রাগ। আর আমার তো লাভ ম্যারেজ। রেজিস্ট্রি করাই ছিল। রেজিস্ট্রি ম্যারেজ বাবা মানবে কেন, বাবা সোস্যাল ম্যারেজ চাইল। মেয়ে পক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা কইতে চাইল। আমি কতবার বললুম এত তাড়ার কি আছে, সেজদার বিয়েটা হয়ে যাক আগে, তারপর হবে খনে। আমি কি করব। আমার বাবা বড়দা আর মেজদাকে নিজে হাতে কারবার করে দিয়ে গেছলেন। সেজদা ছোড়দাকেও কিছু পয়সাকড়ি দিয়েছিলেন কারবার করবার জন্য। একমাত্র আমাকেই কিছু করতে হয়নি। অঙ্কে এইট্টির কমে কখনও পেতুম না। আমার জন্য এই মাস্টার ওই মাস্টার করতে হয়নি। আমাকে কারবারের জন্য টাকাও দিতে হয়নি। সম্পত্তি ভাগের সময় আমিই সবচেয়ে কম। সব এক কথা—কুটুতো ইঞ্জিনিয়ার, ও নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নেবে। সবাই তাহলে নিজে করে নিক। বড়দা-মেজদাকে কারবারের ক্যাপিটাল এবং নো-হাউ দিয়েছ। আমার জন্য কিচ্ছু ইনভেস্ট করতে হয়নি তার রেজাল্ট হল—আমিই পেলাম সবচেয়ে কম।

সেজদাটা যে কেন এমন হল! ভালো কারিগর পেয়েছিল সেজদা, ওর চানাচুরের কারবারের জন্য। সেজদা এখনও চানাচুর করে? কতদিন ওর চানাচুর খাইনি। সেজদার জীবনের বহু ফুটেজ খেয়ে গেল, শট ওকে হল না। যা করে তাই ফ্লপ। মনে হয় কারবারে লালবাতি ঝুলিয়ে দিয়েছে। নইলে হাবিজাবি করার এত টাইম পায় কোথায়? বাবার মুখে একটা কথা শুনতাম—কুকুরের কাজও নেই আবার অবসরও নেই। সবসময় বিজি। এখানে ছুটছে। ওখানে যাচ্ছে, হাঁপাচ্ছে, কিন্তু দেখ, অ্যাকচুয়ালি কোনো কাজই নেই। সেজদারও সেইরকম। ক'মাস আগে আমার জামাইবাবুর হার্টে বাইপাস হল। একমাস পড়েছিল নার্সিং হোম-এ। একদিনের জন্যও সময় হল না গিয়ে একটু দেখে আসবার।

আমার বিয়ের একটা দিন ঠিক হল পঞ্জিকা-টঞ্জিকা দেখে। ঠাকুরমশাই দিন ঠিক করলেন। আমাদের ফ্যামিলিতে একটা নিয়ম আছে যে বিয়ের নেমন্তন্ন করতে গেলে চিঠির সঙ্গে একটা করে গোটা সুপুরি দিতে হয়। গাড়ি করে বড়দা মেজদা যাবে, সঙ্গে সুপুরি নেবার লোক। মা তখন বেঁচে। সুপুরিগুলো নেই। কোথায় গেল খোঁজ করতে সেজদা বলল—সুপুরিগুলো সব নষ্ট করছ কেন? আমি সুপুরিগুলো যাতে নষ্ট না হয় সেটা দেখছি। কে কী বলবে। বললে কী বশে বসবে কে জানে? ওই সুপারিগুলো কোথায় যাচ্ছে তা কি আমরা বুঝিনি? ছোড়দার বিয়ে সেজদাকে ওভারটেক করেই হল। ছোড়দার বিয়েটা বড্ড হুড়োহুড়ি করে করিয়ে দিল বাবা। তখন যদি সেজদাকে বিয়ে দিত আগে, তাহলে ছোড়দার ভাগ্যে পাগলি বউ জুটত না হয়তো।

আমার বিয়ের পরই—সেজদা কেমন যেন অ্যাডামেন্ট হয়ে উঠল। বাড়িতে মেয়েমানুষ আনল একদিন। সিঁড়ি দিয়ে পায়ের মল বাজাতে বাজাতে এক উৎকট মেয়েছেলে ঢুকল, সঙ্গে সেজদা। সেজদার গায়ে সেন্টের গন্ধ। আমি তখন সিঁড়ি দিয়ে নামছি। সেজদা বলল তুই নামছিস, আর দ্যাখ, আমি উঠছি। বাবার মৃত্যুর পর আরও বেপরোয়া। সেজদার ঘরে পর্দা ঝুলল। পর্দার ভিতর থেকে গান আসতে লাগল 'পর্দে মে রহনে দো, পর্দা না উঠাও।' চুড়ির শব্দ। বারান্দার দিকের জানালা তখন থেকেই বন্ধ।

বাথরুমের বেসিনে মাঝে মাঝে পানসুপুরি জর্দার কুঁচি মাখানো গয়ের। হরিবল্। ওরা সব ফ্ল্যাশটাও ঠিকমতো টানে না। আমি তখন তিন তলায়। দোতলার অন্য ঘর দুটোয় আগে তালা পড়েনি। বাবা ঘর দুটো গেস্ট রুম করতে বলেছিলেন, সেজদা বাবার কথা রাখল। এক বুড়িকে ওই ঘরে দেখা গেল রাত্রে। ওই বুড়ি সোনাগাছির। এরপরই তালা পড়ল ঘরে। আমার যে কী অবস্থা বাড়িতে বউয়ের কাছে মুখ দেখাতে পারি না। বউ বলল কিছু একটা করো।

কী করব আমি?

দাদাদের বললাম। দাদারা বলল—একটা ফ্ল্যাট দেখে নে।

এটা কোনো কাজের কথা হল?

ফ্ল্যাট তো দেখলাম। কিন্তু একটা লোকের হুইমস্-এর কাছে স্যারেন্ডার করে চলে যেতে হবে? কেন যাব নাথের বাগান ছেড়ে, আহেরিটোলা ছেড়ে?

একদিন সকালে সেজদা আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে সিঁড়ির সামনেটায় বাজারের থলি হাতে দাঁড়িয়ে গলা চড়িয়ে বলছে—হ্যাগো, শুনছ কী আনব বলো। গলদা আনব? চারশো টাকা কিলোর। কিগো বলো, যা মন চায় বলো। উঁকি মেরে দেখি পর্দা ধরে দাঁড়িয়ে আছে এক প্রায় বুড়ি বয়সিনি, গালের ভিতরে পান, বাইরে মেচেতা, বলছে তোমার যা মন চায় এনো।

তারপর শিল দিয়ে বাটনা বাটার শব্দ, বারান্দায় বসে আলু কুটছে ওই মেয়েছেলে, স্টোভ জ্বালিয়েছে বারান্দায়। দোতালায় একটা রান্নাঘর আছে। ওটা সেজদারই। কমই ব্যবহার করে সেজদা। ঘরেই স্টোভে রান্না করে। বেশির ভাগ দিনই অবিশ্যি হোটেলেই খায়।

সেজদা এল, বলছে, মালতী, আজ আমি পচা মাছ এনিছি। ইচ্ছে করেই এনিছি, তুমি আমার সঙ্গে ঝগড়া করো। প্লিজ। গেরস্ত বউরা যেমন ঝগড়া করে।

ওই মেয়েছেলেটা তখন হি হি করে হাসছে, সেজদা ওকে জড়িয়ে ধরে বলছে একটু মুখ করো মালতী, একটু মুখ করো, আমি একটু সুখ করি।

দাদাদের সব বললাম। জানালাম এবার নন্দিতাকে পার্মানেন্টলি বাপের বাড়ি রেখে আসতে বাধ্য হব, সেটা আমাদের ফ্যামিলির প্রেস্টিজের পক্ষে ভালো হবে না। ছোড়দা, মানে দুলাল কিন্তু এসবের ভুক্তভোগী। তিনতলায় থাকে। একতলায় মেজদাকে এসব পোহাতে হয় না, সল্টলেকে বড়দা তো দিব্যি আছে। বলেছিলাম পার্টির ছেলেদের দিয়ে সেজদাকে একটু শাসিয়ে দে। ছোড়দা খেঁকিয়ে উঠল। বলল—পার্টি ফার্টির কথা আমায় বলবি না। তা ছাড়া তোরা ভাবিসটা কি বলতো, পার্টি কি অন্যকে চমকাবার জন্য নাকি! কে কোথায় বাড়িতে প্রস ঢোকাচ্ছে পার্টিকে কি সেখানেও ইনটারফেয়ার করাবি নাকি তোরা? ছোড়দা আজকাল খিটখিটে হয়ে গেছে কেমন। ও অবিশ্যি আছে ওর নিজের জ্বালায়। ওর পাগলি বউটাকে কিছু করতে পারছে না। মাঝে মাঝে কিন্তু ভালো থাকে। আবার যখন মাথা গরম হয় তখন যা-তা করে। সেজদার সঙ্গে ওই পাগলিকে ভিড়িয়ে দিলে খুব রগড় হয়। খুব ইচ্ছে করে আমার।

দাদাদের কয়েকদিন বলাতে একদিন সেজদার সঙ্গে বসল। বড়দা এল গাড়ি হাঁকিয়ে। বড়দা বলল, দ্যাখ সেজো, তুই আমাদের ফ্যামিলির প্রেস্টিজ ডুম করে দিচ্ছিস, বাইরের প্রস ঘরে ঢোকাচ্ছিস। যা করেছিস করেছিস। এবার এসব বন্ধ কর।

সেজদা তখন যা তা বলল।

সেজদার বমির শব্দ আবার।

নন্দিতা আমার চোখের দিকে তাকাল। আমি বললাম তবে দেখেই আসি। নন্দিতা বলল বেশি ইয়ে দেখাতে যেও না। সেজদার ঘরে ঢুকলাম। কতদিন পর। টেবিলের ওপর একটা লাল জবা শুকিয়ে এলিয়ে আছে। কতগুলি ছোটো ছোটো ফোটো-স্ট্যান্ড। একটা বাচ্চা শুয়ে হাত-পা ছুঁড়ছে। আমার বাচ্চারই মতো। বাচ্চা কোলে একটা প্রায় বুড়ি মতো। ওই বুড়িটাই তো, যাকে সেজদা বলেছিল তুমি একটু মুখ করো, আমি তবে সুখ করি। সেজদারও একটি ছবি আছে বাচ্চাটা সঙ্গে নিয়ে, ওই বুড়ি, আর একটা বছর তিরিশের মেয়েও আছে। পিছনে তাজমহল। তাজমহলের সামনের

গাছগুলো দেখে বোঝা যাচ্ছে ওই তাজমহল স্টুডিওতে থাকে। টেবিলে সাদা একটা কাগজ। পেনটা খোলা। শ্রীচরণেষু মা, তোমাকে জানাই আমার দুঃখের কথা। শোনো বলি... এতটুকুই লেখা। মা? সেই কবে স্বর্গে গেছেন। মায়ের একটা ছবি বড়ো করে বাঁধিয়েছিল সেজদা। দেয়ালে তাকালাম। ছবিটা রয়েছে। একটা শুকনো ফুলমালা। ছবিটা পুরো বডি। পাটাও দেখা যায়। পায়ের তলায় সেজদার একটা পাসপোর্ট সাইজ ছবি সাঁটানো। ঘরের দেয়ালে ভূতের ছবি, উলটোপালটা দাগ। সেজদা মেঝেতে নয়, খাটেই। সেজদার কাছে যাওয়াই মুশকিল। মেঝেতে বমি, চাদর-বালিশেও। আমি ওর কপালে হাত রাখি। কত দিন পর। চাপ দি। সেজদা চোখ খুলেই বন্ধ করে নেয়। খুব উইক হয়ে গেছে। সেজদা সেজদা বলে জোরে জোরে ডাকি। ডাকতে গিয়ে গলা কেঁপে ওঠে। সেজদার শুধু একবার চোখের পাতা নড়ে! দুলালের ঘরে যাই। দুলাল নেই, দুলালের বউ একা একা লুডোর চাল দিচ্ছে। সাপলুডোটা খোলা। তখন বিকেল চারটে মতো হবে। ডাক্তার পাওয়া মুশকিল। আমি নিজেই গেলাম আমাদের হাউস ফিজিসিয়ানের বাড়ি। অডটাইম। ডাক্তারবাবু তখন ক্রিকেট খেলা দেখছিলেন। ডাক্তারবাবু তো জানতেন না, ওই খেলাটা তখন খেলা হচ্ছে না। খেলার অভিনয় হচ্ছে। ম্যাচ আগেই গট আপ হয়ে গেছে। ইশ্, ওইসব খেলা দেখতে দেখতে কত লোক উত্তেজিত, কত লোক কাঁদছে, কাগজে পড়ি হার্ট অ্যাটাকও হয়ে যায় কারুর। ওই ঘুষ মাখানো বানানো খেলার অভিনয় দেখে।

ডাক্তারবাবুকে জোর করেই নিয়ে এলাম। ডাক্তার ঘরে বমিটমি দেখে বললেন—এখনও পরিষ্কার হয়নি?

আমি আমার কোম্পানির ম্যানেজমেন্টের লোক। টক করে বলে দিলাম—আপনাকে দেখানোর জন্যই বমির স্যাম্পল রেখে দিয়েছি।

ডাক্তারবাবু সেজদার কপালে হাত দিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—ড্রিংক করেছিলেন?

উত্তর নেই।

তিনবার জিজ্ঞাসা করার পর সেজদার গলা থেকে যে আওয়াজ বেরুল, তাতে আমি বুঝলাম সেজদা বলছে ইয়েস। ভীষণ জড়ানো।

এখনও জড়ানো ? তবে কি সকালেও আবার মাল খেয়েছে নাকি?

আমি সেজদাকে জিজ্ঞাসা করি—ক'পেগ, অ্যাঁ? সেজদা ডান হাতটা একটু উঁচু করে পাঁচটা আঙুল দেখাল, একটা হাতে পাঁচের বেশি দেখানো যায় না বলে বাঁ হাতটাও উঁচু করতে চেষ্টা করল। ওঠাতে পারল না। ডাক্তারবাবু কপাল কুঁচকোলেন, ছোটো হাতুড়ি দিয়ে ঠোকাঠুকি করলেন হাতে, পায়ে, হাঁটুতে। চোখের মণিতে টর্চ দিয়ে মন দিয়ে দেখলেন। তারপর বললেন--বোধহয় সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়েছে। এখুনি হাসপাতালে নিয়ে যান।

মেজদাকে ডাকি। অ্যাম্বুলেন্স ডাকি। অ্যাম্বুলেন্স এল। সেজদাকে ডাকি জোরে জোরে, সেজদা ওঠো, সেজদার সাড়া নেই। কানের সামনে মুখ নিয়ে বলি—সেজদা, আরও দু পেগ খাবি? তবু সাড়া নেই। বুকের কাছে কান দিয়ে শুনি শব্দ আছে।

আমরা ধরাধরি করে সেজদাকে স্ট্রেচারে তুলি, সেজদাকে স্ট্রেচারে তুলতে গেলে ওর বালিশ আর চাদর সরে যায়। আর ওমনি, কী বলব, বালিশের তলায় যেন কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে সেই হাতিছাপ কাঁথা। যেন এক্ষুনি ফণা তুলবে। হ্যাঁ, সেই হারিয়ে যাওয়া কাঁথা! আমি বমি মাখা চাদর টেনে নিয়ে কাঁথাগুলিকে আড়াল করি।

সেজদা, তুই এই কাঁথাগুলি কেন চুরি করলিরে! কী লাভ তোর? তুই কি নন্দিতার মনে কষ্ট দিতে চেয়েছিলি? ছিঃ এত মিন মাইন্ডেড তুই?

অ্যাম্বুলেন্সে মেজদা আমায় জিজ্ঞাসা করল, সেজোর অ্যাকাউন্ট কার সঙ্গে জয়েন্ট রে? আমি তো জানি না। আমি ঠোঁট উলটোলাম। দুলালের সঙ্গে হতে পারে। মেজদা বলল। আমি সেজদার দিকে চেয়ে থাকি। হাঁ করা মুখ। সামনের একটা দাঁত পড়ে গেছে। কবে? কবে রে? সেজদা দাঁত দিয়ে দারুণ আখের চোকলা ছাড়াত। সেজদার চোখটা আধখোলা। সেজদা

রাত্তিরে দেখা স্বপ্নের কথা বলত। আমাদের বাড়ির তলায় যে নৌকোটা আছে, সেজদা স্বপ্ন দেখত সেই নৌকোটা করে একটা নতুন রাজ্যে যাচ্ছে। সেই সুন্দর রাজ্যটার নাম অবন্তীনগর। ওখানে সবাই সবাইকে ভালোবাসে। তুই অবন্তীনগরে যাচ্ছিস না তো সেজদা? আমি সেজদার আধখোলা চোখের দিকে চেয়ে হাসি মুখ করি। সেজদার চোখ নড়ে না, মুখ নড়ে না। মুখ দিয়ে জোরে নিশ্বাস নিতে গিয়ে দুই ঠোঁট জোড়া লাগার সুতোটা ছিঁড়ে গেল। হাতটা ধরি। তোর হাত ধরে শিমুলতলার জঙ্গলে ঘুরতাম। হাতের আঙুলে আঙুল রাখি। আংটিটা কোথায় গেল। মুক্তোর আংটিটা!

মা মারা যাবার পর মায়ের গয়না খুলে ভাগাভাগি হয়েছিল আমাদের ভাইবোনদের মধ্যে। পাঁচটা কৌটোর মধ্যে গয়নাগুলো ভাগ করে রেখে লটারি হয়েছিল। সেজদার ভাগ্যে মুক্তোর আংটি আর হীরের নাকছাবি উঠেছিল। সেজদা ওই আংটিটা পরে থাকত। অনেকটা সোনার মধ্যে বেশ বড়সড় মুক্তো, একটু নীলচে আভা। আমি একবার বলেছিলাম রাত-বিরেতে বাড়ি ফিরিস, আংটিটা না পরাই ভালো। সেজদা বলেছিল তাতে কি, মায়ের স্মৃতিটা অন্য একজনের কাছে গিয়ে স্মৃতি হয়েই তো থাকবে। সেজদার কী জ্ঞান আছে এখন? বুকের কাছে কান নিয়ে সেজদার বুকের ধুকপুকি শোনার ইচ্ছে হল। সেজদার বুকে হাত রাখি, ধুকপুকি পাই। আমার আর সেজদার রক্ত একই গ্রুপের। বি মাইনাস। আমার স্কুটার অ্যাকসিডেন্টের পর সেজদা রক্ত দিয়েছিল। সেজদাকে একবার ঝগড়ার সময় বলেছিলাম তুই কিছুতেই চেঞ্জ হবি না, তোর রক্তের মধ্যেই লাম্পট্য রয়েছে। সেজদা বলেছিল আমার রক্ত তোর বডিতেও আছে, মনে রাখিস। আমিই দিয়েছিলাম। আমি বলেছিলাম আই অ্যাম আনফর্চুনেট টু রিসিভ ব্লাড ফ্রম ইউ। তা ছাড়া তোর সেই রক্ত আমার বডিতে নেই। জেনে রাখ হিমোগ্লোবিন একশো কুড়ি দিনে ভেঙে যায়। সেজদা বলেছিল কৃতজ্ঞতাটাও একশো কুড়ি দিনে ভেঙেই যায়, কুটু?

কৃতজ্ঞতাই বলো, আর কর্তব্যবোধই বলো, আমিই কিন্তু নার্সিংহোমে নিয়ে যাবার বুদ্ধি দিয়েছিলাম। মেজদা জিজ্ঞাসা করছিল কোথায় নিবি?

ডাক্তার পিজি-র কথা বলেছিল। রবিবার দিন হাসপাতালে ডাক্তার থাকে না। আমি জানি। আমিই সল্টলেকের একটা নার্সিংহোমের কথা বললাম। নার্সিংহোমে রাত জাগতে গিয়ে বহুদিন পরে আমরা ভাইরা অনেক কথা বললাম। নিজেদের সুগার ব্লাডপ্রেসার কোলেস্টেরলের কথা জানলাম। লক্ষ করলাম কার কতটা চুল পেকে গেছে, কার কতটা থুতনি ঝুলে গেছে। ছোড়দার সমস্যার কথাও উঠল। বড়দা বলল—ডিভোর্স ফাইল করে দিতে পারতিস। কতবার বলেছি পাগলি হলে ইজিলি ডিভোর্স হয়ে যায়। মেজদা বলল—ইজিলি হয় না। প্রমাণ করতে হবে এই রোগ চিকিৎসা করলেও সারবে না। ছোড়দা কথা ঘোরাতে চাইছিল। বড়দা বলছিল স্রেফ বাপের বাড়ি গিয়ে রেখে আসতে। বৌদির দাদাকে বলা—মাসে কিছু টাকা দেব, বাড়িতে অশান্তি হচ্ছে। আমারও তাই মত। বললাম খুব ভয়ে ভয়ে থাকি। কখন যে কী করে বসে।

ছোড়দা বলল—মেয়েটা এতটাই বোকা, সুইসাইড করতেও জানে না। দ্বিতীয় রাতে মেজদা আসেনি। বড়দা শরীর খারাপ বলে আগে চলে গিয়েছিল। আমি রাত ১১টা পর্যন্ত। দুলাল, মানে ছোড়দা ছিল। থার্ড রাতে শুধু ছোড়দা। যাই হোক, সেজদা বাড়ি ফিরল। ওর বাঁ অঙ্গ পড়ে যাবে ভাবা হয়েছিল। তা হয়নি। বাঁ হাতের মুঠোয় কিছু ধরতে না পারলেও একটু আধটু নাড়াতে পারে। ডাক্তারবাবু বলে দিয়েছিলেন ফিজিওথেরাপি করালে অনেকটা ঠিক হয়ে যাবে। এখনও ফিজিওথেরাপিস্টের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়নি। যা কিছু আমাকেই তো করতে হবে।

সেজদার ঘরে বৌদি এসেছিল। তৃপ্তিবৌদি, মানে পাগলিবৌদি। বৌদি ঘোমটা তুলে পাশে বসেছিল। ভাসুরঠাকুর কিনা। বলেছিল আমি আপনাকে চামচ দিয়ে খাইয়ে দেব। কাউকে চামচ দিয়ে, ঝিনুক দিয়ে খাওয়াতে খুব ভালো লাগে। ভাতের দলা হাতে চটকে মেখে নরম করে খাওয়াতে খুব ভালো লাগে। কোনোদিন কাউকে খাওয়াইনি। আপনি আয়া উঠিয়ে দিন। বলেছিল কতদিন আপনার গান শুনি না। আগে রাতদুপুরে কী সুন্দর গাইতেন, পাইপের মধ্যে শোনা যেত। পাইপ বলতে বোধ হয়

রেইন ওয়াটার পাইপটার কথাই বলছে। ঘরের ঝাঁঝরি দিয়ে কথা ঢোকে। পাইপের ভিতর দিয়ে উপরে-নীচে চলে যায়।

তো সেজদা এখন গান গাইছে। হুঃ। বোধ হয় তৃপ্তিবৌদির অনুপ্রেরণায়। মা আমায় ঘুরাবি কত চোখ বাঁধা বলদের মতো।

কিছুটা জড়ানো গলা। তবে মাল খেয়ে গলা জড়ানোর সঙ্গে এই অস্পষ্টতার কতটা তফাত। আজকাল কথা বলার সময় মুখ দিয়ে লালা গড়ায় সেজদার। নার্সিংহোম থেকে ফিরে সেজদাকে যখন বিছানায় শোয়ালাম ফের, সেজদা আমার পিঠে হাত মুখের লাল সমেত বলল—ভালোছেলের বাপ, ভালো থাক। আমার জন্য অনেক করলি। তোর ছেলে যেন মেত্‌তুনজয় হয়। মেত্‌তুনজয় মানে কি কোনো মৃত্যুঞ্জয়ী মহাপুরুষ? নাকি আমাদের নাথের বাগানের মৃত্যুঞ্জয় সাধুখাঁ? সরষের তেলের কারবারি! সকালে কাককে কচুরি খাওয়ায়। ওর জ্যাঠামশাইকে খুব মান্যিগণ্যি করে। ওর জ্যাঠার নামে দাতব্য হোমিওপ্যাথি ডাক্তারখানা দিয়েছে। বাইরের ঘরে একটা জ্যাঠামশাইয়ের পাথরের মূর্তি রেখেছে। ওড়িয়া বামুন এসে রোজ মালা পরিয়ে দেয়।

আমার সেজদাও যে আমার ছেলের জ্যাঠামশাই....।

সেজদা গান গাইছে। সেজদার মনে আজ একটু ফুর্তি ফুর্তি ভাব। গানের কথা পালটাচ্ছে। কে প্রথম কাছে এসেছি, কে প্রথম ভালোবেসেছি। এইসব গানও সেজদা জানে! আগে বিশেষ শুনিনি। একটা মানুষের মধ্যে কতরকমের ভাঁজ কতরকমের ফোল্ড, কত ক্রস্‌সেক্‌শন। সেজদার আজ চিত্তে মহরম। হাই-এন্ট্রপি। পুরো সোনাগাছি আজ সেজদার ঘরে।

নার্সিংহোমে ভর্তি হবার দিনতিনেক পরে জ্ঞান এসেছিল সেজদার। তার পরেও দিন তিনচার লোক চিনতে পারত না। আসলে সেরেব্রাল হ্যামারেজ সকাল থেকেই শুরু হয়েছিল। ওই জন্যই বমি হচ্ছিল। হ্যামারেজটা অল্প করে হচ্ছিল, কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে হয়েছে। নার্সিংহোমে যখন

পৌঁছেছিলাম, একেবারেই জ্ঞানহীন। আর কিছুক্ষণ দেরি হলে বাঁচত না। যখন জ্ঞান এল, দিন তিনেক পর থেকে লোকজন চিনতে পারল। আমি ঝুঁকে পড়েছিলাম ওর মুখের কাছে। চিনতে পেরেছিল। বলেছিল—কুটু?

বললাম—হ্যাঁ, কুটু।

একটু মালতীকে খবর দে।

বোঝ অবস্থা। আমি চুপ করে থাকি। সেজদা বলে কিরে, খবর দিবি না?

কোথায় থাকে?

দশনম্বরে।

দশ নম্বর কী?

দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিট।

তখনও স্যালাইন চলছে।

সপ্তাহ তিন নার্সিংহোমে ছিল সেজদা। এর মধ্যে কম করে পনেরো বার বলেছে মালতীকে একবার নিয়ে আয়। লক্ষ্মীভাই আমার। ও কী ভাবছে বলো তো? ওর মেয়ে সুইসাইড করল। পরদিন থেকেই আমি যাচ্ছি না। আমার যে এরকম হয়েছে সেটা তো খবর দেওয়া দরকার।

কী করে যাব ওখানে? শেষকালে নাকি সেজদা নার্সিংহোমের এক জুনিয়ার ডাক্তারকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিল সোনাগাছির দিকে যাতায়াত আছে ভাই? যদি যাও, আমার একটু উপকার করবে? সেই হাউসস্টাফটি আমার কাছে নালিশ করেছিল। সেজদার এই হাল দেখে এবং শুধুমাত্র ফ্যামিলি প্রেস্টিজ বাঁচাতে ওই মালতীকে খবর দেওয়া করলাম। নিজে যাইনি। আমার এক বন্ধু আছে, অভয়, খুব ডেসপারেট। ও নাকি ওখানে গিয়েছিল। প্রেম করে বিয়ে করেছি ঠিক কথা, বিয়ের আগে কিন্তু কখনও বডি রিলেশন করিনি। বিয়ের পর যখন কনডোম কিনতে হত, সত্যি বলছি, আমার লজ্জা করত। ওকে দিয়েই কেনাতাম। ও সেজদার ব্যাপার স্যাপার কিছুটা জানত। ওকেই বললাম। ও বলল নো প্রবলেম্।

একদিন নার্সিংহোমে এল ওই মালতীবালা। সেই বুড়িবুড়ি মহিলা। বুড়ি বলতে যা বোঝায়, ততটা নয় অবশ্য, ধুমসি কালো, মেচেতার দাগ। যাকে সেজদা বলেছিল তুমি একটু মুখ করো আমি একটু সুখ করি, সেই মহিলা।

সেজদার কপালে অনেকক্ষণ ধরে হাত বুলোল ওই মেয়েছেলেটা। সেজদা বলল, এবার মাইরি আমি ভালো হয়ে যাব।

সেজদা গান গাইছে, বাড়িতে আজ ওই মালতী। আর একটি মেয়ে আছে, বছর পঁচিশ। খুব গয়নাটয়না পরেছে। একটা কচি বাচ্চাও রয়েছে। বছর খানেক হবে হয়তো। সকাল থেকেই বাড়িটা নরক। খিস্তি, জোরে টেপ চালানো, স্টোভে রান্না সাঁতলানোর রসুন, পিঁয়াজের গন্ধ, এরই মধ্যে মাঝেমাঝে কান্না। মালতী কাঁদছে, আমার সব গেল। ওই মেয়ে আমার কলজেটা খামচে নিয়ে চলে গেল। নিমকহারাম মেয়ে। আমার কথা একবারও ভাবলি না, নিজের মেয়ের কথাও ভাবলি না। সেজদা ওর পিঠে হাত বুলিয়ে বলছে দুঃখ করো না। কী করবে বলো। মেনকাও তো শকুন্তলাকে ফেলে পালিয়ে গিয়েছিল। শকুন্তলা কী ভেসে গেছে?

নার্সিংহোম থেকে ফেরার পর একটা আয়া মতন রাখা হয়েছে। সেজদার রান্নাটান্না করে দিত। এখনও দেয়। নন্দিতা বাপের বাড়ি। বাচ্চাটার নিরাপত্তার জন্যই পাঠাতে হয়েছে। কাজের লোকটা একটু ফুটিয়ে টুটিয়ে দিয়ে যায়। সেজদার জন্য খরচার ব্যাপারে মেজদা-বড়দা কিছু দিয়েছে, কিন্তু আমারই মেজর শেয়ার এবং মেজর ঝামেলা। নন্দিতা কবে আসতে পারবে কে জানে। ও খুব ভয় পেয়েছে। নার্সিংহোম থেকে আসার পর যখন একটু সুস্থ হল, তখন বায়না করত, কুটুরে, তোর বাচ্চাটাকে একবার একটু এনে দেনা মাইরি, দেখি আমার সঙ্গে কতটা মিল, একটু আদর করি। নন্দিতা বলত মাথা খারাপ? ওর হাতে তুলে দেব? এডস্ আছে কিনা ঠিক নেই, মুখ দিয়ে নাল গড়াচ্ছে, ম্যাগো। বাচ্চাটার কান্না শুনলেই সেজদাও চ্যাঁচাত, ঘড়ঘড়ে গলায় বলত—নিয়ে আয় আমার কাছে, নিয়ে আয়। সেজদার অসুখের পর সেজদার সঙ্গে যেহেতু একটু ভাবসাব হয়েছে, কথাবার্তা চলছে একটু আধটু, এজন্য সেজদা ওর অধিকারের এরিয়া বাড়িয়ে দিয়েছে। নার্সিংহোমেও সেজদা বলত—মাঝে মাঝে পুচকুকে একবারটি একটু কোলে

নিয়ে আয় না, একটু দেখব। বউকে এসব তখন বলিনি। বউকে ওই কাঁথার কথাও বলিনি। ওই হাতিছাপ কাঁথা। ওই কাঁথা নিয়ে কোনো কথা সেজদাকেও বলিনি। আর একটু সুস্থ হোক, চার্জ করব। ওপেন জিজ্ঞাসা করব। কেন তুই ওই কাঁথা সরালি? কাঁথা কটা ওর বিছানার তোশকের তলাতেই রয়েছে। ওই কাঁথাগুলো নিয়ে এলে নন্দিতা অবশ্য ইউজ করত না। কিছুতেই না।

সেজদা এখন গান গাইছে। এখন শ্যামাসঙ্গীত নয়। জিন্দেগি এক সফর হায় সুহানা...। সেজদার সঙ্গে সঙ্গে গাইছে ওই বুড়ি, আর মেয়েটাও। মেয়েটা কে, কে জানে? বুড়ির মেয়েটা তো শুনেছি সুইসাইড করেছে। কে ওটা? আজ আয়াটা নেই। বোধহয় ছুটি দিয়ে দিয়েছে। ওরা এখন সব বারান্দায়। সেজদাও বারান্দায়। সেজদা একটু আধটু হাঁটতে পারে এখন। ফিজিওথেরাপি করালে আর একটু ভালো পারত নিশ্চয়ই, বাঁ হাতটা এখনও ভালোভাবে নাড়াতে পারে না। ফিজিওথেরাপি মানে আবার খরচ। কে জোগাবে? বড়দা একটা প্রস্তাব দিয়েছিল। বলেছিল মায়ের বিয়ের নাকছাবিটা লটারিতে শিলু পেয়েছে। ওটা কী করবে ও। বড়দা ওটা নিতে চায়, রেখে দিতে চায়। নাতবৌকে দেবে। এর বদলে কয়েক হাজার টাকা সেজদার অ্যাকাউন্টে রেখে দেবে। প্রস্তাবটা বেশ ভালোই। কিন্তু কে বলতে যাবে ওকে? যদি খিস্তি দেয়? মেজদা, ছোড়দাকে ধরল। বলল— দুলাল, তুই বল। ছোড়দাই কথাটা পাড়ল। বলল—সেজদা, গয়নাগাটি তো একটা অ্যাসেট, দরকারের সময় ব্যবহার করার জন্য। এখন তোর জন্য খরচাপাতি হল অনেক, দাদারাই করেছে সব। তোর তো হীরের নাকছাবিটা পড়ে আছে, ওটা... মুখের কথা কেড়ে নিয়েই সেজদা বলেছিল—কে বলল ওটা আমার কাছে আছে? নেই। যখন রেখার ডেডবডিটা দেখলাম, লাল মেঝের মাঝখানে কালো পাখাটার ওপরে রেখার মাথা, নাকের তলায় শুকিয়ে যাওয়া রক্ত ছিল, ওর নাকে নাকছাবিটা ছিল না। মরা মেয়েটার নাক থেকে কে ওটা গ্যাঁড়া করে দিল। মানুষ এমন শুয়োরের বাচ্চা। ব্যস। এরপর আর সেজদার সঙ্গে কী কথা হতে পারে?

আমরা পরে দাদা বৌদিরা মিলে মিটিং করেছিলাম। বলাবলি করলাম অধঃপতন কতদূর হলে মায়ের শরীরের গয়না একটা বেশ্যাকে দেওয়া যেতে পারে? আমরা সবাই মিলে অনেকবার ছিঃ বললাম। সমস্ত 'ছিঃ' শব্দগুলি সেজদার ঘরের দেওয়ালের কোণার মাকড়সার জালের মধ্যে আটকে গিয়ে ঝুলতে থাকল। মেজবৌদি তো বলেই ফেলল—অত যত্ন করে অ্যাম্বুলেন্স ডেকে নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়ার প্রতিফল পাচ্ছ তো...। আমি বললাম এই দুঃখেই ফিজিওথেরাপি করাচ্ছি না বৌদি। বড়োবৌদি বললেন, ছাড়ো তো, দরকার নেই। একে তো নাচনি, তার ওপর নাই বা পড়ল ঢাকের বাড়ি। গুড় খেয়ে তোমাদের সেজো পাটালি হাগে, বললে খারাপ শোনায়। আমরা ঠিক করলাম ওই ফিজিওথেরাপি টেরাপি করাতে যাব না। তাহলেই বাইরে বেরুতে পারবে না। বাইরে বেরুতে না পারলেই বাছাধন টাইট থাকবে। ওই সব খারাপ পাড়ার মেয়েটেয়ে যদি বাড়িতে আসে, ঢুকতে দেয়া হবে না। যেহেতু নিজেদের ভাই, ফেলে দিতে তো পারব না, সবাই মিলে টাকা দিয়ে ছাতে একটা ঘর করে ওকে ওখানে চালান করে দেব। দোতলাটায় আমি পুরোটায় থাকব। তিনতলাটায় দুলাল থাকবে। আমি অনেক সেফ থাকব। আমরা ভাইরা পালা করে টিফিন ক্যারিয়ারে ভাত পাঠিয়ে দেব। বাঁ অঙ্গ যেমন পড়ে গেছে তেমনই থাক, পুরো ঠিকঠাক হয়ে গেলেই আবার পেয়ে বসবে, মানে গুড় খেয়ে পাটালি হাগবে।

সেজদা যখন গাইছে, ডান হাত দিয়ে ওর নিজের ডান হাঁটুতে তাল দিচ্ছে। বাঁ হাতটা স্থির। হাসতে হাসতে জাঁহাসে গুজর দুনিয়া কে তু পরোয়া না কর...। খেয়েছে কিনা কে জানে। এই শরীরেও কিছু বিচিত্র না। আমাদের বাড়ির যে জমাদার ছিল, ওর নাম ছিল মথুর। ওর গলায় ক্যান্সার হয়েছিল ইউসোভেগাসে। ইউসোভেগাস কেটে বাদ দেওয়া হয়েছিল, খেতে পারত না। ওর পেটে একটা ছিদ্র ছিল, ওখানে লিকুইড খাবার দিয়ে দিত। মথুরকে দেখতাম পেটে ফানেল লাগিয়ে বাংলা মদ ঢালছে। বিড়ি টানছে। বিড়ির ধোঁয়া তো পেটে যায় না, ফুসফুসে যায়।

সেজদা বুড়িটাকে বলে, এবার তুমিও গাও। কী যে আরম্ভ করেছে সকালবেলায়। বুড়িটা বলল, আমার কি আর গান গাইবার মন আছে এখন...। সেজদা বলল, তাহলে সাধ না মিটিল আশা না পুরিল গাও। আরে গাও না গো।

বুড়ি গাইল।

সেজদাও গলা মেলাল। কোরাস। প্রেসার কুকার ফোঁস করল তখন। মাংস গন্ধ।

ধুর। থাকব না আর এ বাড়িতে। আর থাকা যাবে না। বড়দাকে তো এসব পোয়াতে হচ্ছে না। মেজদা দিব্যি আছে একতলায়। ছোড়দা নিজের জ্বালায় জ্বলছে। এসব ব্যাপারে কথা উঠলে ছোড়দা এখন স্পিকটি নট হয়ে থাকে। পুরো ঝক্কিটা আমার। শালা সেরেব্রাল স্ট্রোকেও...। ছিঃ বলতে নেই। ছাতে গিয়ে মোটামুটি একটা সার্ভে করে নিলাম ঘরটা কীরকম হতে পারে। চারতলায় একবার উঠিয়ে দিতে পারলে আশা করি ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। একতলায় নামতে পারবে না। নামলেও উঠতে পারবে না আর।

চারতলায় চিলেকোঠায় ছোড়দার জিনিসপত্রে জ্যাম। লোহার রড, চাকা, সব জাংক। মরচেও পড়ে গেছে সব। সব রিজেক্ট মাল। সের দরে বেচে দেবে, না রেখে দেবে। কীসের মায়া? কীসব বইপত্র। জাংক। রিজেক্ট মাল। বিপ্লবের স্তর। কী করিতে হইবে?—ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন। সমাজতন্ত্রের পথে—চিন্মোহন সেহানবীশ। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মূলসূত্র—জে কুসারভ, বিংশ শতাব্দী প্রকাশনী। রিজেক্ট মাল। দে, সের-দরে বেচে দে। কীসের মায়া?

চিলেকোঠার সাইড দিয়ে একটা ঘর আর একটা টয়লেট করে দিলেই সেজদাকে ওপরে পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে। দাদারা কবে টাকাকড়ি দেবে ঠিক-ঠিকানা নেই, আমি নেক্সট উইকেই মিস্তিরি লাগিয়ে দেব। কিন্তু কর্পোরেশনের অ্যাপ্রুভালের বোধহয় একটা ব্যাপার আছে। অনেকদিন পর ছাতে উঠে দেখলাম আমাদের এলাকাটাও পালটাচ্ছে। কলকাতার অন্য এলাকাগুলো পালটে যাচ্ছিল, আমাদের এলাকাটা পালটাচ্ছিল না ততটা।

অনেক বাড়ির সামনে রোয়াকগুলো বেচে ছিল, মুড়ি তেলেভাজার দোকান ছিল, চাই বেলফুল ফেরিওয়ালা ছিল। মালাই-বরফ হাঁক ছিল। রিকশায় চড়ে ম্যাটিনি সিনেমা দেখতে যাওয়া বৌদিরাও বহুদিন ছিল। নর্থ ক্যালকাটার বাড়িগুলো হচ্ছে শান্তিপুর কৃষ্ণনগর চুঁচড়ো হুগলির গ্রাম। শুধু তৈরি হয়েছে ইট-চুন সুরকি-সিমেন্টে। আমি ইঞ্জিনিয়ার কিনা, তাই ঠিক বুঝি দেশের দাওয়ার বদলে রোয়াক, উঠোনের বদলে চাতাল। সেই বাইরের ঘর, ভেতরের ঘর। গোয়ালঘর আর ধানের গোলার স্মৃতিও এইসব বাড়ির প্ল্যানের মধ্যে গোপনে রয়ে গেছে। তবে এখন নতুন নতুন ফ্ল্যাট উঠছে। হাওড়া ব্রিজটা কী সুন্দর দেখা যেত ছাদ থেকে, এখন আর দেখা যায় না, নতুন ফ্ল্যাটে আটকে গেছে। শেতলা মন্দিরের চূড়াটা কই? বটকেষ্ট পালেদের পুরনো বাড়িটা ভেঙে দিয়ে ওখানে ফ্ল্যাট উঠছে। আমাদের এই বাড়িটা ভেঙে দিয়ে এখানে ফ্ল্যাট ওঠানো যায়। পাঁচতলা বাড়িতে দশটা ফ্ল্যাট তো হতে পারত। কিন্তু এতে লাভ নেই। আর একটু জায়গা যদি থাকত, প্রমোটার ইন্টারেস্টেড হত। জমি যখন কিনলেই সস্তায়, আর একটু কিনতে পারলে না? বাবা, তোমার একদম বুদ্ধি ছিল না।

নন্দিতা বাপের বাড়ি বলে মেজদার ঘরে দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়া করে বেলা তিনটে নাগাদ উপরে উঠেছি, একটু শোব, দেখি আরও ক্যাওস। সেজদার ঘরের জানালার সামনে চ্যাঁচামেচি। ওই বুড়িটা চ্যাঁচাচ্ছে—দরজা খোলো, দরজা খোলো। আমাকে দেখতে পেয়ে বলল— দ্যাখো দ্যাখো তোমার দাদা আমার নাতনিটাকে নিয়ে কী করছে। কমবয়েসী মেয়েটা গালমন্দ দিচ্ছে। আমি জানালা দিয়ে দেখি সেজদা কী একটা যেন বাচ্চাটার পায়ুদেশে ঢোকাবার চেষ্টা করছে। ওটা তো জানি, গ্লিসারিন সাপোজিটার। সেজদার জন্য অনেক আনা হয়েছিল। ওকে গ্লিসারিন সাপোজিটার দিয়ে পায়খানা করানো হত। সেজদা ডান হাতটা দিয়ে বাচ্চাটাকে চেপে ধরেছে, প্যারালিসিস হয়ে যাওয়া বাঁ হাতটা দিয়ে গ্লিসারিন স্টিকটা বাচ্চাটার পেছনে ঢোকাবার চেষ্টা করছে। পারছে না। বাঁ হাতটা কেবলই কাঁপছে। পিছলে যাচ্ছে, দরজার ছিটকিনি বন্ধ, দেয়ালে ভূতের ছবি। আমি চেঁচিয়ে

বলি—এসব কী পাগলামি হচ্ছে সেজদা, তোর কি পুরো মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি অ্যা? এসব কী পারভারশন, অ্যা?

সেজদা শুধু আমার দিকে একটু নির্বিকার তাকাল। কিছু বলল না। একবার দরজার দিকে তাকাল, সম্ভবত ছিটকিনিটা ঠিকমতো বন্ধ আছে কিনা দেখবার জন্য। গ্লিসারিন স্টিকটা ঢোকাবার চেষ্টা করতেই থাকল। শেষ পর্যন্ত স্টিকটা চালান করে দিল ভিতরে। তারপর বাচ্চাটাকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগল— আমার বুকে হেগে দে সোনামণি, আমার কলজেটা, আমার গায়ে হেগে দে।

আমি ওই মেয়েছেলেগুলোকে জিজ্ঞাসা করলাম ব্যাপারটা কী?

কমবয়েসি মেয়েটা বলতে শুরু করল—বাচ্চাটা ঘুমিয়ে পড়েছিল। ওই ঘরে খাটে শুইয়ে দিয়ে বারান্দায় বসে পান সিগারেট খাচ্ছিলুম, তো বাতাবিবাবু ঘরে ঢুকল। দরজা ভেজিয়ে দিল। রেখাদি আমাকে মরার আগের দিন হাত ধরে বলেছিল চুমকি, ছিবলিটাকে দেখিস, আমি কিন্তু সবসময়ে খেয়াল রাখি। আমি ভাবলুম দেখি তো বাচ্চাটা কী করছে, বাচ্চাটা চোখে দেখে না কিনা! দেখি দরজা বন্ধ। জানালা দিয়ে দেখি বাতাবিবাবু এই কাণ্ড করছে।

সেজদার নাম বাতাবিবাবু? কত কি জানি না।

বাচ্চাটা চ্যাঁচাচ্ছে। বুড়িটাও চ্যাঁচাচ্ছে। কম বয়েসীটাও। চিৎকার শুনে পাগলিবৌদি নেমে এল উপর থেকে। এই রে! কাকে সামলাব আমি। পাগলিবৌদি জানালা দিয়ে ব্যাপারটা দেখল। বৌদি কি বুঝল কে জানে, জানালার শিকের ভিতর দিয়ে দুহাত বাড়াল। এমন করে বাড়াল যেন দেয়াল ভেদ করে শংকর হালদার লেন-এ ঢুকে যাবে। দুহাতের ঝাপটা সমুদ্র ঢেউয়ের মতো সামনে গড়াচ্ছে, দাও... দাও। সেজদার দৃকপাত নেই। আমিও চ্যাঁচাচ্ছি সেজদা, খোল দরজা, সেজদা...। ও নির্বিকার। লালাময় মুখে বাচ্চাটাকে চুমু খাচ্ছে। সেজদা বকে চলেছে—রানী আমার, কলজে আমার, ফুসফুস আমার, অক্সিজেন আমার, হেগে দে সোনা, আমার সারা গায়ে হেগে দে। বাচ্চাটার ঘোলা চোখের মণি এপাশ ওপাশ নড়ছে। হি হি

হাসছে।

বাচ্চটা এবার সশব্দে পায়খানা করল সেজদার বুকে, আর সেজদার মুখে ফুটে উঠল পদ্মফুল। সেজদা বলল দুষ্টু কোথাকার!

সেজদা বাচ্চাটাকে বিছানায় রেখে উঠে দাঁড়ায়। হলদে রং-এর অর্ধতরল ওই পদার্থের দিকে কেমন আনন্দে তাকাল। তারপর তোশকের তলা থেকে বার করে নিল হাতিছাপ কাঁথা। সেই কাঁথায় প্রয়াগ-স্নান করা সন্ন্যাসীর মতো গা মুছল সেজদা। ছিটকিনি খুলল ডান হাতে। বাঁ হাতটা অসহায় ঝুলছে।

ওরা চলে গেল। বিকেল নেমেছে। ইলেকট্রোপ্লেটিং কারখানার অ্যাসিডের গন্ধ মেখে দখিনা বাতাস ফকির মিত্র লেন-এ ঢুকে পড়েছে। সেজদা গান গাইছে।

গান গাইছে বাথরুমে। মনরে কৃষি কাজ জানো না। বাথরুমে জলের শব্দ। দরজা খোলা। সেজদা গু মাখা হাতিছাপ কাঁথা জলকাচা করছে। ধরেছে দু হাতে। বাঁ হাতেও। থুপ থুপ। থুপ থুপ। জলের শব্দ। থুপ থুপ। থুপ থুপ। গানের শব্দ। কী আশ্বর্য! প্যারালিসিস হওয়া বাঁ হাতটাও নড়ছে। বাঁ হাতটাকে প্রাণ দিল গু জড়ানো হাতিছাপ কাঁথা। সেজদা গান গাইছে।

চার

আমাকে বিয়ে দিয়েছিল কম্পিউটার।

সবার ধারণা ছিল কম্পিউটার ভুল করে না। তখন কম্পিউটার এর এত প্রচলন ছিল না। অল্প কিছু অফিসে ছিল। সরকারি অফিসে কম্পিউটার ঢুকতে বাধা দিচ্ছে আমাদের পার্টি, বলছে কম্পিউটার এসে সবার চাকরি চলে যাবে। সেই 'কম্পিউটার দ্বারা পাত্র-পাত্রী যাচাই করিয়া বিবাহ দেয়া হয়' এরকম কোনো বিজ্ঞাপন দেখেছিলেন আমার বুড়ো বাবা। কম্পিউটার শব্দটাই তখন একটা মোহ তৈরি করছে। যেমন কম্পিউটারে চোখ দেখা হয় মানে কোনো ভুল হবে না। কম্পিউটার জ্যোতিষও দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞাপনে। আমায় যে ঘটক, মানে কম্পিউটার বিয়ে দিয়েছিল, তার, নাম ছিল, মনে আছে 'ম্যাচ মেকার'। 'ম্যাচ মেকার'-এ আমার নাম, জন্মতারিখ, হ্যানত্যান ঢোকানোর পিছনে আর একটা বড়ো কারণ ছিল টাইম। খবর-কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে কিংবা ঘটক লাগালে ব্যাপারটা দেরি হয়ে যাবে, তাই কম্পিউটার লাগানো। একটা কম্পিউটার লাগানো মানে হাজারটা ঘটক একসঙ্গে লাগিয়ে দেয়া। এরকমই ধারণা। আর তাড়াহুড়ো করার কারণ হল আমার ছোটোভাই কুটু। কুটু এদিকে রেজিস্ট্রি সেরে রেখেছে, কাউকে বলেনি। বাড়িতে বিয়ের কথা বলল, মেয়েটা নাকি চাপ দিচ্ছে। বাবা ভাবল বড়োর বিয়ের আগে ছোটোর কী করে বিয়ে হয়। ব্যস, ফাঁসলাম।

খুব একটা অমত করিনি বিয়ের ব্যাপারে। আমার কোনো প্রেম ট্রেম ছিল না কারুর সঙ্গে। আমি মনে মনে দু-একজনের প্রেমে পড়লেও আমার প্রেমে কেউ কখনও পড়েছে বলে মনে হয়নি। একবার একটা ইন্টুপিন্টু

হয়েছিল। হঠাৎই। এ নিয়ে আমার একটু অপরাধবোধও হয়েছিল। ব্রতীনকে কেসটা বলেছিলাম। ব্রতীন বলেছিল, অন্যায় করেছিস। আর করিস না। ব্রতীন আমার খুব বন্ধু। আমার সঙ্গে স্কুলে পড়ত। খুব ভালো ছিল লেখাপড়ায়। ওই তো আমাকে কল্লোল দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল মিনার্ভা থিয়েটারে। ওই তো আমাকে পড়তে দিয়েছিল এঙ্গেলস্-এর বাংলা অনুবাদ বই। ও আমাকে বুঝিয়েছিল মানুষের ইতিহাস টিতিহাস। শুধু ব্রতীন কেন, সে সময় আরও বন্ধু ছিল আমার, যারা বলত একটা নতুন সমাজের কথা। আমার খুড়তুতো ভাই তারক, কী ব্রিলিয়ান্ট ছেলে, প্রেন্সিডেন্সিতে পড়ত। গ্রামে চলে গিয়েছিল। ও বলত গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরবে। এই কলকাতা শহরও। ক'দিনের জন্য বাড়ি এসেছিল। একদিন শুনলাম গুলি খেয়ে মরে গেছে। চারিদিকে উন্মাদনা। পিকিং রেডিও শুনছে কেউ। গান বাঁধছে কেউ। আমি বণিক ঘরের ছেলে। আমাদের সাত পুরুষের ব্যবসা। হিসেব মতো আমিও বুর্জোয়া। কিন্তু থিওরিটিক্যালি বুর্জোয়াদের একটা অংশ প্রগতিশীল হয়। আমি নিজেকে প্রগতিশীল বুর্জোয়া ভাবতে শুরু করেছি। ইতিমধ্যে নিজে ব্যবসা শুরু করেছি, বাচ্চাদের তিন চাকার সাইকেল। উপায় নেই, ব্যবসা ছাড়া উপায় নেই আমাদের, কে দেবে চাকরি? আমার ওই ছোট্ট কারখানায় যারা কাজটাজ করত, ওদের বোনাস দিতাম, মাইনেও যতটা পারতাম বেশিই দিতাম। নিজেকে ভাবতাম র‍্যাডিক্যাল বুর্জোয়া। বাবার কালির কারখানায় ঘনা নামে একটি ছেলে কালির বড়ি চুরি করে পোস্টার লিখত। মে দিবসের, ভিয়েনামের, শ্রমিক চাষীর। একদিন ধরা পড়ল। ওকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। আমি তো তখন উদার বুর্জোয়া, ডিক্লাস্ড্ হবার চেষ্টা করছি, হরেকৃষ্ণ কোঙার কেমন করে ডিক্লাস্ড হয়েছিলেন জেনেছি। আমি ঘনাকে আমার কারখানায় ঢোকালাম। বাবা জানলেন, অসন্তুষ্ট হলেন। দাদারা জানাল, ওরাও বলল, এটা বাবাকে অপমান করা। আমিও ভেবেছিলাম—যদি ওটা অপমান করাই হয়, বেশ করেছি। এই 'বেশ করেছি' ভাবটা বেশ তৃপ্তি যেমন দিত, আবার কম্প্রোমাইজ করার জন্যও মাঝে মাঝে অ্যাটিচিউড তৈরি করত। পুরোপুরি

তো রিবেল হয়ে যেতে পারিনি। বাবার বাড়িটার অধিকার ছাড়তে পারব না। থাকব কোথায়, তা ছাড়া পার্টির আমি নেতা টেতা কিছু নই। সাধারণ সিমপ্যাথাইজার মাত্র। পার্টি অফিসে যোগাযোগ আছে। নেতারা তখন বেশির ভাগই পাজামা-পাঞ্জাবি পরতেন। খদ্দরের পাঞ্জাবি। ধুতি পরা কমরেডও দেখেছি। গলায় সোনার চেন ঝোলানো নেতা—ভাবাই যেত না। এখন তো দেখি সাফারি স্যুট, পকেটে সেলফোন, ডানহিল সিগারেট, গা থেকে সুগন্ধ।

তো, বাবা-দাদারা যখন বিয়ের কথাটা বলল, খুব একটা আপত্তি করিনি। এইটিতেই বুঝে গেছিলাম ওই বিপ্লব টিপ্লব ওভাবে হবে না। ভোট টোট করে পার্টি দিল্লিতে বসবে। তখন পশ্চিমবঙ্গের বঞ্চনার কথা বলছে, এার ১৪টি পণ্যের দাম বেঁধে দেয়ার কথা বলছে। হ্যাঁ, ১৪টাই, ১৫টা নয়। তাহলে বিয়েতে অমত করে লাভ কী?

মেয়ে দেখতে গেলুম। সঙ্গে ছিল বাবা, মেজদা, মেজবৌদি, দিদি, জামাইবাবু। মেয়ের বাবা নেই। সৎ মা। সৎ দাদা। পুরনো বাড়ি, বৌবাজারে। পড়তি অবস্থা। মেয়ের দাদার সোনার দোকান। দোকানে কিছুই নেই, ভালো আয়না পর্যন্ত নেই। মেয়ের দাদা বে থা করেনি। দেয়ালে একটা সমুদ্রের দৃশ্য দুবছরের পুরনো ডিসেম্বর মাস দিয়ে ঝুলে আছে, আর একটা বাংলা ক্যালেন্ডার—মুখ হাঁ করে যশোদাকে ব্রহ্মাণ্ড দেখাচ্ছে নাড়ুগোপাল। একটা মাকড়সা গোপালের মুখে। মেয়েটা মাথা নিচু করে বসে। একটা সেলাই মেশিন ঢাকনা দেয়া। মেয়ে হাতের কাজ জানে—মেয়ের পিসিমা বলল—ওর মায়ের থেকে এই গুণ পেয়েছে। ওই যে মায়ের কাজ করা। একটা দেয়ালের উপরের দিকে দেখাল। একটা কাচ বাঁধানো ফ্রেমের দিকে তাকাই। সুতোর এমব্রয়ডারিতে লেখা : ধনের গৌবব ফুলেব সৌবভ বহে নাকো চিবদিন। র-এর যাবতীয় পুটকিগুলো চুমকি বসানো ছিল। সম্ভবত আঠা নষ্ট হয়ে পুটকি পড়ে গেছে।

মেজবৌদি জিজ্ঞাসা করেছিল রান্না জানো তো? মেয়েটা ঘাড় নেড়েছিল। আমি কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিনি। আমার তো এমনিতেই

একটু প্রগতিশীল প্রগতিশীল ভাব ছিল। এরকম কনে বাজিয়ে নেয়ার প্রক্রিয়াটি পছন্দের ছিল না। তবুও এভাবে মেয়ে দেখতে এসেছি বলে আমার ভিতরে ভিতরে একটা অপরাধবোধ ছিল। এজন্য আমি কোনো প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করা দূরের কথা, ভালো করে তাকাইনি পর্যন্ত।

মেজবৌদি জিজ্ঞাসা করেছিল, কী খেতে ভালোবাস?

—মাংস।

—সব মাছ খাও?

—খাই না।

—কী মাছ খাও না?

—পচা মাছ খাই না। গন্ধ লাগে।

—আমাদের ছেলেটাকে দেখো। পছন্দ হয়েছে তো?

—মাথায় টাক।

এভাবে কেউ বলে না। মেয়েটা বলল। আমরা ফেরার সময় গাড়িতে বলাবলি করলাম মেয়েটা কত সরল। তা ছাড়া বেশ বোঝা গেল মেয়েটার দুঃখ আছে। ওর সৎ মা হয়তো মাঝে মাঝে পচা মাছটাই ওকে দেয়। আর মাংস ভালোবাসে মানে মাংস নিশ্চয়ই কম খায়।

ওরা বলল মেয়ে তো মন্দ নয়। দুলালের জন্য চলে।

'দুলালের জন্য চলে' কথাটায় কিন্তু বোঝার আছে। অন্য কারোর জন্য চলে না। দুলালের জন্যই চলে। কারণ দুলাল ইস্ত্রি করা জামাপ্যান্ট পরে না, দুলাল চায়ে ডুবিয়ে পাউরুটি খায় এবং তাতেই টিফিন হয়ে যায়। লোডশেডিং হলেও দুলালর ঘুম হয়। সুতরাং দুলালের জন্য চলে। ওরাও বলল, আর আমিও ভাবলুম—মা মরা মেয়ে, কষ্টে আছে। গরিবের বাড়ি থেকে একটা মেয়ে আনলুম। ঠিক আছে। গরিবের মেয়ে উদ্ধার করলুম—এ লাইনে যাচ্ছি না কিন্তু। এটা কিন্তু ফিউডাল চিন্তাধারা। যদিও আমাদের দেশে ফিউডালিজিম এখনও ভালোই আছে, অনেক জায়গায় ক্যাপিটালিজম-এর সঙ্গে এমনভাবে পান্চ করে আছে যে বোঝাই যায় না। ব্রতীন বেশ উদাহরণ দিয়ে বলে।

শুভদৃষ্টির সময় মনে হয়েছিল এরকম করে তাকাচ্ছে কেন? সব বলে না, মদির মদির দৃষ্টি। কোথায় সেই দৃষ্টি! ফুলশয্যার রাতে রজনীগন্ধার চেন সাজানো খাটে বসে ও প্রথম কথাটা বলল—এটা তোমাদের নিজেদের বাড়ি?

আমি বললুম—তবে না তো কি।

ও বলল—তোমাদের বাড়িতে গুজরাটি ভাড়াটে আছে?

আমি বললাম—গুজরাটি ভাড়াটে কেন?

ও বলল—এমনি।

আমি বললাম—আমাদের বাড়িতে কোনো ভাড়াটেই নেই।

ও তখন আমার কাছে একটু ঘন হয়ে বসে বলল—আমায় একটা বাড়ি করে দেবে গো? গুজরাটি ভাড়াটে বসাব। প্রথমে ভেবেছিলাম ইয়ারকি। একটু পরেই একটা ঘটনায় আমি শকড্। বুকে হাত দিয়েছিলাম। ও বলল, এখানে হাত দিও না। বাড়ির ঠাকুরমশাই এখানে হাত দিত, তখন মা বলেছে কখনও হাত দিতে দিবি না। তুমিও হাত দিও না।

বুঝলাম। সেই রাত্রেই সব বুঝে গেলাম। বাবা, দাদা, বৌদি, সবাই বুঝল। ওর দাদাকে বললাম। ওর দাদা বলল—দেখেশুনেই তো নিয়েছেন...। যেন মাল পাল্টাতে আসা খদ্দেরকে বলছে...।

বাবা বললেন, লাক তো মানিস না। লাক বলে কিছু আছে। গ্রহদোষ বলে কিছু আছে। নইলে এতজন লোক মিলে মেয়ে দেখতে গেলি, কিছু বুঝতে পারলি না।

এমনিতে তেমন কিছু বোঝা যায় না। ব্রতীন এসেছিল, ওকে মুড়ি আলুর চপ খেতে দিয়েছিল, জিজ্ঞেস করেছিল বউ আছে কিনা, বউ-এর কটা সিল্কের শাড়ি আছে, বউকে নিয়ে আসবেন। সবই ঠিক ছিল। ব্রতীন আমায় ফিস ফিস করে বলল—কই, সবই তো ঠিক আছে। তুই যে বলিস...। বউ চা নিয়ে এসে টেবিলে চা-টা রেখেই বলেছিল—আমার স্বামীর টাকাপয়সা বুঝি আপনি নষ্ট করেন।

অন্য কেউ হলে ভাবত নির্ঘাৎ আমিই বলেছি। ব্রতীন তা ভাববে না। আমার দিকে তাকিয়ে ব্রতীন বলেছিল—এবার ব্যাপারটা বোঝা গেল।

ব্রতীন পরে বলেছিল কেসটা এমন কিছু টাফ নয় বোধহয়। সাইকোলজির ডাক্তার দেখা, কমে যাবে।

ডাক্তারের কাছে গিয়েওছিলাম। ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলল অনেকক্ষণ। প্রথমদিকে বেশ ভালোই কথা বলছিল। একটু পর ডাক্তারকে বলল—আমার দিকে এরকমভাবে অসভ্যের মতো চেয়ে আছেন কেন, অ্যাঁ?

আমি ডাক্তারকে বললাম—এটাই হল রোগ। হঠাৎ হঠাৎ কী যে করে কিছু বোঝায় উপায় নেই।

তৃপ্তি তখন বলল—রোগ আবার কী? সত্যি কথা বললেই রোগ। বাজে কথা বলছ। আমার প্রেসার দেখাবার নাম করে এখানে পাগলের ডাক্তারের কাছে নিয়ে এসেছ?

ডাক্তারবাবু আমাকে বলেছিলেন—এটাকে বলা যায় বাইপোলার ডিসঅর্ডার। ব্যক্তিত্বের একটা অংশ যেন লুকোন জায়গা থেকে আলাদীনের দৈত্যের মতো বেরিয়ে আসে। মূলত ডিপ্রেশনের জায়গা থেকেই এসব হয়। ম্যানিক ডিপ্রেসিভ সাইকোসিস। অনেকদিন ওষুধ খেতে হবে।

কিছুতেই ওষুধ খাবে না তো আমি কি করব। বাড়তেই লাগল ওর পাগলামি। জিনিসপত্র ভাঙচুর করে না, কিংবা কাপড়চোপড় খুলে ফেলে না, তবে বকবক করে। আমার ভাগে যেহেতু দুটো ঘর, দুটো ঘরে দুটো খাট রেখেছি। আমি আলাদা শুই আজকাল। আগে একসঙ্গেই শুতাম। মাঝেমধ্যে শারীরিক মিলনটিলনও হত। উদাসীন সঙ্গম কোথায় যেন পড়েছিলাম—না কে যেন বলেছিল। কার যেন কবিতার মধ্যে ছিল। সুনীল গাঙ্গুলীর বোধ হয়। ওই কথাটা খুব রিয়ালাইজ করি আমি।

ওকে আমি তাড়াইনি। ডিভোর্স চাইলে হয়ে যেত। এসব কেসে হয়ে যায়। ডিভোর্স ফাইল করিনি আমি। কোথায় যাবে ও। নতুন সমাজের কথা সত্তর দশকে খুব তো বলেছি। এখন এটুকুই না হয় করি। একটা পাগলিকে না হয় খাওয়া পরা দিয়ে রেখেই দি। এইটুকু করলেও ন্যাতানো ঝাণ্ডাটা নড়েচড়ে।

সেজদার স্ট্রোক হয়েছিল, সেরেব্রাল স্ট্রোক। ওর মুভমেন্ট এখন রেস্ট্রিক্টেড। ভালো করে হাঁটা চলা করতেও পারছিল না। আজ বেরিয়েছিল দুপুরের দিকে। এখনও ফিরে আসেনি। আমার বউ তৃপ্তি আমাকে দুবার বলে গেছে দাদা আসেনি। খুব সেজদার ফ্যান হয়েছে ও। দাদার রান্নাটা তৃপ্তিই করে। নুনটুন কম-বেশি হয় বটে, সেজদা কিন্তু তৃপ্তি করেই খায়। ছাদে চিলেকোঠার ঘরে এখন সেজদার থাকার ঘর। বাবা-মায়ের ছবি আছে। কালীও। সেজদা রামপ্রসাদী গায় বটে, কিন্তু রামপ্রসাদী হয় না। মাল খাওয়া বন্ধ। চিলেকোঠার ঘরটা পরিষ্কার করার সময় বেশ কষ্ট হয়েছিল আমার। ওখানে আমার জিনিসপত্রই ছিল বেশি। আমার ভুল বেঁকানো রডপাইপ, ভুল ডায়ামিটারের চাকা, ভুল রং-এর রেক্সিন। ভেবেছিলাম সব ভুলগুলো মিলিয়ে একদিন নতুন কিছু করব। নতুন কিছু করা হয়নি, ভাবা হয়নি বলে ওসব বাতিল হয়ে গেল। আমার প্রোডাক্টে ওসব লাগে না। সের দরে বিক্রি হয়ে গেল ওইসব। আর ছিল বই। রাষ্ট্র ও বিপ্লব, তুমি আমায় কম্যুনিস্ট করেছ, জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব প্রসঙ্গে, কমপ্লিট ওয়ার্কস অফ লেনিন...। ওইসবও সের দরে? আমি বেচিনি। একটা বস্তায় পুরে আবার আমার শোবার ঘরের চৌকির তলায় এনে রেখেছি বেড়ালি মায়ের মতো। হুলোর দৃষ্টি এড়াবার জন্য বিড়ালি মা বাচ্চাদের পালটে পালটে রাখে।

কথা ছিল সেজদার খাবার টিফিন ক্যারিয়ার করে ভাইরা পাঠাবে। কুটু প্রথমে বলল—সেজদার তো খাবারে রেস্ট্রিকশন, নুন কম, তেল কম, ঝাল কম, এদিকে নন্দিতা তো বাঙাল, বুঝিসই তো, ও কীরকম পছন্দ করে। দু'রকম রান্না খুব ডিফিকাল্ট। তুই ই ম্যানেজ কর। আমি কিছু ধরে দেব। মেজদাও। আমি বললাম—কী হল মেজদা! মেজদা বলল—মাসের মধ্যে কুড়ি দিন তুই তো ম্যানেজই করছিস আর দশ দিন বাকি রাখিস কেন। তুই-ই কর। কিছু ধরে দেব।

. কুটু কিছু কিছু দিচ্ছে, কিন্তু মেজদা ভুলে যাচ্ছে। আমার চলে যায়। আমার তো একস্ট্রা খরচ তেমন কিছু নেই। আমার বউয়ের বিউটি পার্লারের খরচ নেই, কসমেটিক্স-এর খরচ নেই। বাচ্চার কোক-ক্যাডবেরি

কিনতে হয় না, স্কুল বাস টিউশন খরচ এসবও তো নেই। কারখানার অবস্থা খারাপ হলেও কোনোরকমে চলে যায় আমার। আমাকে দেখেই মেইনলি, পাড়ার লোকেরা বলে এ মল্লিক বাড়ি আর সে মল্লিক বাড়ি নেই।

আমার বিজনেসের অবস্থা বেশ খারাপ। চলে না। আগে বাচ্চাদের তিন চাকার সাইকেল তৈরি করতাম, প্যারামবুলেটার তৈরি করতাম। প্র্যাম। বিজনেসই আমি করতে চাইনি। কিন্তু পাকে চক্রে—বিজনেস বলো, আর যাই বলো, জড়িয়ে পড়েছি।

ব্রতীন ছিল আমাদের ক্লাসের ভালো ছেলে। সেকেন্ড-থার্ড হত। আমি কিছু হতাম না। কোনোরকমে পাস করে যেতাম। রেজাল্টে প্রতি বছরই লাল দাগ থাকত তবু প্রমোশন পেয়ে যেতাম। তখন স্কুলে ব্যাগ নিয়ে যাবার চল ছিল না। হাতে করে বই নিয়ে যেতাম। টিফিন নিলে ব্যাগ নিতাম। টিফিন নিতে চাইতাম না খুব একটা। টিফিন না নিলে পয়সা পাওয়া যেত। সেই পয়সা দিয়ে আলুকাবলি, ঘুগনি এইসব খেতাম, ওকে মাঝে মাঝে আলুকাবলি খাওয়াতাম। ও পরীক্ষায় আমাকে ট্রানস্লেশন বলে দিত। এভাবেই বন্ধুত্ব হয়েছিল নীচু ক্লাসে। আমার মাস্টার ছিল বাড়িতে, ওর ছিল না। ও দু'একটা অঙ্ক করতে দিত, আমি স্যারকে দিয়ে করিয়ে আনতাম। ওদের বাড়িতে গেলাম, একটা দশ ভাড়াটের বাড়ির একটা ঘরে থাকে। কল নিয়ে, জল নিয়ে, ঘুঁটের বস্তা রাখা নিয়ে, সোমত্থ মেয়ের চান দেখা নিয়ে ঝগড়া হচ্ছে অনবরত। বস্তি বাড়ি নয়, দালান বাড়ি, কিন্তু বস্তিই। ওর বাবা একটা চটকলে কাজ করত। টাইম ক্লার্ক। ব্রতীনই আমাকে প্রথম বলে—শোন মানুষকে ভগবান হট করে সৃষ্টি করেনি। ধীরে ধীরে হয়েছে। কিছুদিন পরে দেখলাম ইস্কুলে ডারউইনের থিওরি পড়াল। ক্লাস এইটে একদিন বলল—শোন, এই যে পাথরটা দেখছিস, এর মধ্যে অনেক অণু আছে। অণুর চেয়েও ছোট হল পরমাণু। পরমাণুর ভিতরে দুটো মেন জিনিস আছে, ওগুলো অদল বদল করতে পারলেই লোহাকে সোনা করে দেওয়া যায়। আমি সায়েন্স পড়িনি। কমার্স পড়েছি জয়পুরিয়ায়। কিন্তু স্কুলেই ক্লাস টেনে প্রোটন টোটন কীসব পড়িয়েছিল, তাতেই মনে হয়েছিল

ব্রতীন ঠিকই বলেছে। ক্লাস টেনে ব্রতীন বলল—গরিব বড়োলোক সব সমান হয়ে যাবে একদিন। রাশিয়াতে হয়ে গেছে, চীনে হয়ে গেছে। আমাদের এখানেও হয়ে যাবে। যারা চাষ করে জমির মালিক হয়ে যাবে তারাই। যারা কারখানায় কাজ করে কারখানার মালিক হবে তারা...।

বলে কি ব্রতীন। তাই? ব্রতীনের সব কথাই তো সত্যি হয়।

তখন খুশিদাকে দেখতাম, পাজামা আর নোংরা পাঞ্জাবি গায়ে, দেয়ালে কাগজ লাগাচ্ছে, বক্তৃতা করছে, রিকশাওয়ালাদের সঙ্গে আড্ডা মারছে। লোকের কোনো কাজে সাহায্য করছে, কেউ মারা গেলে শ্মশানে যাচ্ছে, খুশিদা কম্যুনিষ্ট। খুশিদার সঙ্গে ব্রতীন কথা বলত। ঘুরত। ব্রতীনই খুশিদার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। খুশিদা কতগুলো বই পড়তে দিল। আদিম সমাজ, রাষ্ট্র ও পরিবার, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ...। ৬৭ সালে যখন যুক্তফ্রন্ট ভোটে জিতল, পাড়ার ল্যাম্পপোস্ট গুলোর লাল রং, আমার খুব আনন্দ হল। সে বছরই হায়ার সেকেন্ডারি পাস করলাম। জয়পুরিয়াতে ভরতি হলাম। আমি কমার্স, ব্রতীন সায়েন্স।

তারপর তো নানান কাণ্ড। অজয়বাবু জ্যোতিবাবুর ঝগড়া, ঘেরাও। জমিদখল। ব্রতীন জি এস হল। আমিও ছাত্রফেডারেশনের নেতা। যুক্তফ্রন্ট ভাঙল। ৬৯ সালে আবার হল। নকশাল আন্দোলন। চারু মজুমদার, সুশীতল রায়চৌধুরী, কাকা, আজিজুল হক...। ব্রতীন বোঝাল নকশাল আন্দোলনকে কেন সমর্থন করে না ওরা। বাম বিচ্যুতি শিশুদের রোগ। লেনিনের কোটেশন। লেনিন কি আর ভুল কথা বলেছেন? আমি ব্রতীনদের সঙ্গেই থাকি। বাবা-দাদারা জানতে পারে আমি কাদের সঙ্গে মিশি। বাবা বলেন—এদের সঙ্গে মিশতে আছে? এরা নাস্তিক। মুসলিম লিগের চর।

নেতা নেতা ভাবটা বেশ উপভোগ করতাম। কলেজে ভর্তির ব্যাপারটায় ইনটারফেয়ার করতাম। ক্যান্টিনে কী মেনু হবে আমাদের কথায় হত। কিন্তু খুব কষ্ট হত তখন, যখন আমাদের যে ছেলেরা মারা গেছে তাদের শহীদবেদী কোথায় হবে সেই জায়গাটা ঠিক করে দিতে হত।

কলেজ শেষ হল। ব্যাক পেয়ে দু'বারে বি কম পাস করলাম। ব্রতীনদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। সিদ্ধার্থ রায়ের সময় এল। নব কংগ্রেস, যুব কংগ্রেস এসব হল। ব্রতীনের ওপর ঝাড় হবার চান্স ছিল। আমাদের বাড়িতে লুকিয়ে রাখলাম—সেই চিলেকোঠার ঘরে। বেশ থ্রিল লাগত। বেনে বাড়ির ছেলে গুপ্ত রাজনীতি করছে। ব্রতীন আন্ডারগ্রাউন্ডে আছে এবং শেলটার দিচ্ছে তাকে দুলাল মল্লিক। বিপ্লবের ইতিহাস তৈরি হচ্ছে।

এই সময় অনেকের বেশ কিন্তু চাকরি-বাকরি হয়েছিল। স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডে, ব্যাঙ্কে। গনিখান চৌধুরী রেলের চাকরি দিচ্ছিলেন। কিন্তু আমি তো মার্কামারা। কী করে হবে চাকরি? অথচ একটা কিছু তো করতে হবে। বিপ্লব অসমাপ্ত রয়ে গেল। পারিবারিক ব্যবসাতে ভিড়ে যাবারও কোনো চান্স নেই। এ-সময়ে গঙ্গার ধারের ঠেক-এ সহদেবের সঙ্গে আলাপ। ওর কাজ চলে গেছে। ইউনিয়ন করছিল বলে কারখানা বন্ধ করে মালিক ডাইরেক্ট দিল্লি থেকে ট্রাকে করে মাল আনাচ্ছে। মাল মানে বাচ্চাদের সাইকেল। এধারে কয়েকটা লেদের কারখানা আছে, কোনো লেদ কারখানায় চাকরি করে দেওয়া যায় কিনা এরকম একটা চিঠি নিয়ে এসেছে দমদম এলাকার কোনো এক কমরেডের কাছ থেকে। সহদেবের বয়স পঞ্চাশের ওপর। দেশ বিহার। কথা বলে জানলাম পুরো কাজটা ও জানে। কোথায় লোহার পাইপ পাওয়া যায়, কীভাবে পাইপ বাঁকাতে হয়, ফ্রেম বানাতে হয়, একটু ওয়েলডিং আর একটা ছোটো প্রেসিং মেশিন, একটা ড্রিলিং মেশিন হলেই কারবার শুরু করা যায়। যতই কম্যুনিস্ট পার্টি করি না কেন, রক্তেই তো রয়েছে কারবার। বাড়ির তলায় পোঁতা রয়েছে বিজনেস শিপ। আমি ভাবি, এখন সহদেবকে ছাড়া নেই। নন্দী ব্রাদার্স-এর সাইকেলের কারবার। ওদের কাছে খবর নিয়ে জানলাম ইউরেকা সাইকেল বন্ধ আছে। বাজারে ডিমান্ড আছে। আমি সহদেবকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। একটু জায়গা জোগাড় করে শুরু করলাম—সহদেব আর একজন মাত্র লোক নিয়ে। আমিও খাটতাম। সহদেব অদ্ভুত ভালো কাজ জানত। ওর

কাছে কাজ শিখলাম। এক এক করে আইটেম বাড়তে লাগল। বেবি ওয়াকার, ব্যালেন্সিং হর্স, রিভলবিং প্র্যাম, কত কিছু। ছোট্ট কারখানা। দুটো লোকও রাখলাম। মাসে তিরিশ চল্লিশটা মাল কমপ্লিট হয়, যা তৈরি হয় বিক্রি হয়ে যায়। প্রফিট যা হত, ভালোই চলে যাচ্ছিল। প্রফিট কীভাবে হয় তা তো জানতাম। সারপ্লাস ভ্যালুর তত্ত্বটা তো জানাই। লাভ মানেই শ্রমিক শোষণ। এখনকার মোবাইল ফোনওয়ালা প্রোমোটার বামপন্থীদের বলছি—এসব ভাবতাম তখন। এসব প্রশ্ন মনে আসত মাইরি আসত। কী আর করব, ভাবতাম বোনাস বাড়িয়ে দেব। যতটা বাড়াব ভাবতাম, গঙ্গার ধারে, পশ্চিমের সূর্যের দিকে চেয়ে, ততটা পারতাম না গলির ভেতরে এসে। কিন্তু কিছু তো বাড়িয়ে দিতাম। যখন গড়ের মাঠে মিটিং হত, আমাদের কর্মচারীদের বলতাম—যা, তোরা যা। মে দিবসে ছুটি দিতাম।

পার্টির মেম্বারশিপ কখনই পাইনি আমি, চেষ্টাও করিনি। ক্রমশ পার্টি অফিসে যাওয়া কমে গেল আমার। তবে ব্রতীন এবং আরও কয়েকজনের সঙ্গে সম্পর্ক থেকে গেল। ওরা আমার কারখানায় এসে চা টা খেত, গল্প টল্প করত। আরও কয়েকজন শ্রমিক আসত ওদের সঙ্গে। ইন্ডিয়ান অক্সিজেন-এর শ্রমিক, ইন্ডিয়ান ফয়েল-এর শ্রমিক। ওরা খেত ভালো সিগারেট, আর আমার শ্রমিক বিড়ি। ওরা ভাবত টিভি কিনবে, আমার শ্রমিকের রেডিও আছে তো ব্যাটারি নেই, ব্যাটারি আছে তো রেডিও নেই। শ্রমিক ঐক্য জিন্দাবাদ, কিংবা দুনিয়ার মজদুর এক হও বলি। কিন্তু জানি এখন ইন্ডিয়ান অয়েল কিংবা ইন্ডিয়ান ফয়েল উঠে গেলে ওদের শ্রমিকরা ওদের জমানো টাকা থেকে একটা পান বিড়ির দোকান অন্তত করে ফেলতে পারে কিন্তু মল্লিক প্র্যাম উঠে গেলে আমার তিন চারজন না খেতে পেয়ে মরে যাবে। এইসব ভেবে কিন্তু ব্যবসাটায় মন দিচ্ছিলাম, সময় দিচ্ছিলাম। ইতিমধ্যে বামফ্রন্ট সরকার হয়ে গেছে। সাতাত্তর সাল।

বিয়েও করলাম। অদ্ভুত একটা বিয়ে। বাড়িতে মন টিকত না। কারখানাতেই পড়ে থাকতাম। সহদেবের সঙ্গে, সুখময়ের সঙ্গে, নান্টু বাচ্চুর

সঙ্গে গল্প করতাম। নাটবল্টু নাড়াচাড়া করতাম। রড বেঁকাতাম, ফাইল ঘষতাম, রং করতাম, রেক্সিন কাটতাম। বাবা মারা গেলেন, বাড়িতে ঝামেলা, সেজদা ঝামেলা করছে, ছিটলেমি করছে, বউ পাগলামি করছে, পার্টি অফিসে বাল্বের আলো পালটে ফ্লুরোসেন্ট, ফ্লুরোসেন্ট পালটে হ্যালোজেন, আর আমি আমার কারখানায় পড়ে আছি, ওয়েলডিং-এর ধোঁয়া, ড্রিলিং মেশিনের আওয়াজ। স্পঞ্জের স্পর্শ খুব ভালো লাগে। সাইকেলগুলোর নাম রাখি—নটি বয়, চ্যাম্পিয়ন, ওয়ার্লড টুরিস্ট এইসব। নন্দী ব্রাদার্স বলছে ইউরেকা সাইকেল অত বড়ো ফ্যাকটরি করেও এই কোয়ালিটির মাল করতে পারেনি। আমি আমার সব রিলেটিভদের আমার প্র্যাম উপহার দিয়েছি। সবাই একবাক্যে বলেছে দুলাল প্রেম করতে না পারুক, প্র্যাম করতে পারে। যখন কুটুর বড়ো মেয়েটা ছোটো ছিল, ওকে দিয়েছিলাম। একদিন দেখি আমার বউ ওটা ঠেলছে। তখন খালি ছিল। খালি প্র্যামের ভিতরে বসা কাল্পনিক বাচ্চার সঙ্গে কথা বলছে— আই বলছি না পড়ে যাবি, একদম চুপ করে বসে থাক। এই তো আমি ঠেলছি...।

বিরাশির ইলেকশানের কিছু দিন পরে খুশিদা মারা গিয়েছিলেন। তিনি ততদিনে বসে গিয়েছিলেন। খুশিদা ব্যাচেলার লোক ছিলেন। একটা কাগজে লিখে গিয়েছিলেন ওর ট্রাংকে যা কিছু আছে তা ব্রতীন আর আমি ভাগাভাগি করে পাব। ট্রাংকের মধ্যে ছিল কিছু বইপত্র। একটা ঘরে একা থাকতেন। নিজে রান্না করে খেতেন। মৃত্যু সংবাদ পেয়ে যখন ওর ঘরে গিয়েছিলাম, তখনও পিঁপড়ের লাইনটা ছিল। বন্ধ জানালাটা থেকে খুশিদার আধখোলা চোখ পর্যন্ত।

ওর কালো ট্রাংকে কিছু বইপত্র ছিল। শ পাঁচেক টাকা, একটা ডায়েরি। ডায়েরির একটা পাতায় আমি আবিষ্কার করি—দুলাল বড়ো দুঃখী কিন্তু বড়ো ভালো ছেলে। ওকে দিয়ে পার্টি করা হবে না। অন্য একটা পাতায় দেখেছিলাম—ব্রতীন, তোরও ভুঁড়ি হলে আমি খুব দুঃখ পাব।

আসলে ভুঁড়ি বাড়ার প্রক্রিয়াটা তখন থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। আর এখন পার্টি অফিসের সামনে যে সব লোকজনদের দেখি, তাদের সঙ্গে

খুশিদাদের প্রকৃতগত তফাৎ ছেড়ে দিলাম, আকৃতিগত তফাৎ অনেক। এই ফাস্ট ফুডের যুগে, ই-কমার্সের যুগে, ক্রেডিট কার্ডের যুগে খুশিদারা একা একা মরে যায়। আমার রডের সাইকেল আর প্র্যাম যেমন মরে যাচ্ছে।

আমি আমার সন্তানের রোগশয্যা পাহারা দেবার মতো রোজই কারখানায় যাই। সহদেব মারা গেছে। অন্য যারা আছে তাদের বহুদিন মাইনে বাড়েনি, বোনাস কমেছে।

একদিন ভজাকে দেখেছিলাম আমাদের স্কুল থেকে বেরুচ্ছে। ভজা আগে নেপাল রায়ের সিমেন্ট কারখানায় ছিল, কাশীপুরে, যেখানে সিমেন্টে গঙ্গামাটি মিশত। এখন সে অন্য বিজনেস করে। ওর কাছেই শুনলাম ও স্কুল কমিটির মেম্বার।

নন্দী ব্রাদার্সে দেখলাম নতুন ট্রাই সাইকেল এসেছে, পাইপ বেঁকানো ফ্রেমের নয়, মোল্ডেড প্লাস্টিকের। বলল, বোম্বের মাল।

বোম্বের মাল আসতে লাগল। অনেক রঙের, যে রং চাও সেই রং-এ পাবে। দামেও কম। হালকা।

বোম্বের পর দিল্লির মাল। ফাইবার গ্লাস। রেজিন। বোম্বেও বানাল রকমারি প্র্যাম। মোল্ডেড ফাইবার গ্লাসের সঙ্গে কিছু মেটালও আছে। অ্যালুমিনিয়াম। বাজার ছেয়ে গেল। খোঁজ নিয়ে জানলাম মোল্ডেড প্লাস্টিক বা ফাইবার গ্লাসের মাল বানাতে হলে কোটি টাকা ক্যাপিটাল নিয়ে নামতে হয়।

আমাদের পাড়ায় একটা লোক তেলেভাজা বিক্রি করত। নামটা মনে আছে, রুইদাস। পার্টি অফিসের কাছেই। যে লোকটা তেলেভাজা বেচত, সে একটা পাটের কলে কাজ করত। ডালবাগান বস্তিতে থাকত, গঙ্গার ওপারে ছিল পাটকল। পাটের কল লকআউট হয়ে গেলেও তেলেভাজা বেচত। পার্টি অফিসে মুড়ি তেলেভাজা খাওয়া হলে ওর কাছ থেকেই কেনা হত। ওর বারো বছরের মেয়েটা ওদের বাড়ি থেকে থালায় সাজিয়ে আলুর চপের লেচি নিয়ে আসত। একদিন মেয়েটা আলুর চপের লেচি লাল ঝাণ্ডাটা দিয়ে ঢেকে এনেছিল। তাই দেখে রুইদাস ওর মেয়েকে ভীষণ

জোরে থাপ্পড় মেরেছিল। মেয়েটার কানের পর্দা ফেটে গিয়েছিল। এইসব রুইদাসরা এখানে আছে বলেই পতাকা নড়ে, এখনও নড়ে।

নন্দীরা বলল—আপনার মাল আর চলে না। ক্বচিৎ দু-একজন লোক এখানে সাবেক ট্রাই সাইকেল খোঁজ করে। সবাই নতুন ডিজাইনের মাল চাইছে। আপনার মালের দাম বেশি। কস্টিং কমান।

ভুজাওয়ালার দোকানপাট উঠে গেল। ও আলু পাতলা করে কেটে রোদে শুকিয়ে ভাজত। পলিথিনে ভরে বিক্রি করত। পটেটো চিপস। দোকানগুলোতে সাপ্লাই করত। উঠে গেল। দোকানগুলো এখন অ্যালুমিনিয়াম কোটিং করা চকচকে প্যাকেটে বোম্বের পটেটো চিপস রাখে। টিভিতে বিজ্ঞাপন হয়। লিপটনের, ব্রিটানিয়ার, আঙ্কেল চিপস্, রাফেলস। অনেক দাম, তবু। আর সেজদার চানাচুর কারখানাটার নাকে তো আগেই অক্সিজেন ছিল, সেজদার সেরেব্রাল অ্যাটাকের পরে ওটা তো উঠেই গেছে। আমার কারবারটাও উঠে যাবে। কী করব তখন? কেউ বলছে ফোল্ডিং চেয়ার টেবিলের বিজনেস কর। ওখানে রড পাইপের কাজ হয়। প্লাস্টিক তো এখানেও এসেছে। একজন বলল—তোমার শেডটা আমায় বেচে দাও। ঠিক ঠাক করে নিয়ে ওখানে একটা কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার করব। আর একদিন ব্রতীন একটা ভদ্রলোককে নিয়ে এল। ওই ভদ্রলোকের হাতে গণশক্তি, আঙুলে আংটি। বলল, রড পাইপের দিন কিন্তু শেষ হয়ে যায়নি। প্লাস্টিক কিছুতেই রড পাইপকে রিপ্লেস করতে পারবে না কমরেড। বইয়ের র‍্যাক বলুন, শো কেস বলুন, মুভিং ট্রলি বলুন, সব বেন্ডিং পাইপ দিয়ে হচ্ছে। ব্যাঙ্ক লোনের ব্যবস্থা আমিই করব। গভমেন্টের অফিসের অর্ডারও ধরব। পার্টনারশিপে আসবেন?

আমি ব্রতীনের চোখের দিকে তাকাই। ওর চোখে উদাসীনতাই দেখলাম মনে হল। পরে ব্রতীনের সঙ্গে কথা বললাম। জিজ্ঞাসা করলাম, ওই বিজনেসে তুইও কি থাকবি? ব্রতীন বলল, আমি আর নাই বা ভুঁড়ি বানালাম। তোরা কর।

এরকম টুকটাক ভালো লাগা থেকে যায় পৃথিবীতে। সবাই সব গুছিয়ে নিচ্ছে। এর মধ্যে দু'একটা ব্রতীন দেখলে মনে হয় সেইসব খুশিদারা থেকে যায়। একবার ট্রেনে দেখেছিলাম, লোকাল ট্রেনে, শীতকালে, ঘুচিমুচি হয়ে বসা একটা খালি গায়ের ছেলেকে হট করে নিজের গায়ের নস্যির গন্ধ মাখানো খদ্দরের চাদরটা খুলে পরিয়ে দিল একটা খোঁচা দাড়ি, পাকা চুলের লোক। ছেলেটা ভ্যাবাচাকা। লোকটা নেমে গেল সোদপুর স্টেশনে।

আমাদের আর এক কমরেড ছিল। মানিকদা। এখন কাঠের বিজনেস করে। নিমতলার কাছে গঙ্গার ধারে ওর কাঠের গোলা। স মিল। ইলেকট্রিক করাতও আছে। কাঠ চেরাই হয়। অনেক জায়গা থেকে কাঠ আসে ওর গোলায়। অসম, তরাই, এমনকি বার্মা-ভিয়েতনাম থেকেও। বার্মা আর ভিয়েতনামের সেগুন খুব দামি জিনিস। একটা ভিয়েতনামী সেগুন-গুঁড়ি চেরাই করতে গিয়ে নাকি ইলেকট্রিক করাতটাই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কারণ কাঠের গভীরে ঢুকে ছিল বুলেট। সেই কবে যুদ্ধ হয়েছিল ভিয়েতনামের জঙ্গলে, গেরিলা যুদ্ধ, সেই বুলেট রয়ে গেছে গাছের গভীরে।

কিছু কিছু থেকে যায়। এভাবেই।

আমি ব্রতীনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তুই আমার কাছে ওকে নিয়ে এলি কেন? ও বলেছিল—তোর বিজনেসটা যদি একটু দাঁড়ায়... আমি বললাম—লোকটা কে? ও বলেছিল—কর্মচারী ইউনিয়নের নেতা। কিছুক্ষণ চুপ থেকে ব্রতীন বলেছিল—করি তো, করি, নানারকম কমপ্রোমাইজ করি। কী করব।

আমার জং ধরে থাকা পুরনো রড পাইপের মতো লাগছিল ওকে।

আমি এখনও ওই লোকটার সঙ্গে কথা বলিনি। বলব না এরকম প্রতিজ্ঞাও নেই। হয়তো বলব, হয়তো মল্লিক প্র্যাম চিরকালের মতো শেষ হয়ে যাবে।

ছাতে একদিন বউকে বললাম—ব্যবসা উঠিয়ে দেব।

বউ বলল—খুব ভালো হবে।

আমি বললাম—ভালো হবে কেন?

—বাড়িতে শুয়ে থাকবে। পা টিপে দেব।

—পা টিপে দিলে খাওয়া জুটবে? কী খাব?

—ভাত, ডাল!

—পয়সা?

—দাদাদের থেকে নেবে। তোমাদের সেজদা তো দিব্যি শুয়ে থাকে। ওর খাওয়া তো আমি দিই। কারবার উঠে গেলে সেজদারও খাওয়া জুটবে না।

—ঠিক জুটবে।

—কী করে?

—দুজনে ভিক্ষে করতে বেরুব বেশ। ভিকিরিদের সঙ্গে বাচ্চা থাকে। ওরা বলে বাচ্চাটাকে খেতে দিতে পারিনি, দুটো পয়সা দাও। শোনো না, শোনো, কাউকে বলবে না বলো, সেজদা না, আমাকে একটা বাচ্চা দেবে বলেছে।

—সেকি! কবে!

—এই তো, ক'দিন আগে। সেজদার রান্নাটা ভালো লেগেছিল। কুমড়ো সেদ্ধ রান্না। আর ডাল। বলেছিল তুমি কি নেবে বল। আমি বলেছিলুম একটা বাচ্চা নেব। বাচ্চা।

—তখন সেজদা কী বলেছে?

—একটা বাচ্চা দেবে বলেছে।

রেডিও নাটক হলে এরকম ডায়লগের ওপরই ঝম্ করে ক্র্যাশিং মিউজিক পড়ে। কী বলতে চায়? সেজদা? কী করতে চায়?

ছাদের সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে প্রায়ই সেজদার ডাক শোনা যায়—তিপ্তি... ও তিপ্তি...। আর ওই তৃপ্তি খুব সুন্দর করে উত্তর দেয়—যাই দাদা...। যেন কত স্বাভাবিক। সেজদার চানাচুর কারখানাটা ক'দিন আগে বিক্রি করা হয়েছে। কারখানা বলতে তো কিছু নয়, বড়ো বড়ো কড়াই, গামলা, সসপ্যান, এইসব। টাকা পাওয়া গেছে স্পেসটার জন্য। স্পেসটা ছাড়ার জন্য। লাখ দুয়েক টাকা। ওই টাকাটা সেজদা যেন না ওড়াতে পারে সে জন্য ব্যাঙ্কে রাখা হয়েছে। জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট। সেজদার সঙ্গে আমার সই। যে

কোনো একজনের সইতে টাকা উঠবে। সেজদা চাইছিল না জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট করতে। বড়দাই চাপ দিয়ে করালে। বড়দা বলল, টাকা আমাদের হাতে। জয়েন্ট তোকে করাতেই হবে। কার সঙ্গে জয়েন্ট করবি বল। সেজদা বলেছিল, দুলালের বউয়ের সঙ্গে। সবাই বলল তা হয় নাকি। সেজদা বলেছিল—কেন হবে না, ও তো টেন অব্দি পড়েছে। নাম সই তো করতে পারে।

এখানে কিন্তু আমার একটু সন্দেহ আছে। আমার মনে হয় না ও টেন অব্দি পড়েছে। কম্পিউটারকে মিথ্যো কথা বলেছিল ওরা।

বড়দা ফিসফিস করে আমাকে বলল জাতে মাতাল তালে ঠিক। ও জানে ওর নামে থাকাটাই সবচেয়ে সেফ...।

বড়দা বলে—অন্য কারুর নাম বল যাকে তুই বিশ্বাস করিস।

—তাহলে দুলাল।

দাদারাও সাপোর্ট করল।

আমি নিমরাজি হয়ে গিয়েছিলাম। টাকাটা এম আই এস করানো হয়েছে। মান্থলি ইনকাম স্কিম। পোস্ট অফিসে। গত ক'মাস টাকাটা তুলে আনি, সেজদাকে দি। ওষুধপত্র আনায়। ক্যাসেট কেনায়—ওই টাকা থেকেই। আমিই এনে দি। আর সপ্তাহে একদিন একটা করে নিপ্। শনিবার। সেজদার গলায় একটা শ্যামাসঙ্গীত শুনেছিলাম, সেজদার নিজস্ব রচনা—শনিবার আসতে কেন দেরি করাস মাগো/সোম, মঙ্গল, বুধ কেটে দিয়ে শনিবারটাকে রাখো। সেজদা বেরুতে পারে না বলে কালীর কাছে শনিবার তাড়াতাড়ি এনে দেবার প্রেয়ার করে। আবার কালীকে যখন তখন খিস্তিও দেয় আজকাল। বলে কালী না শালী। একটা অদ্ভুত টাইপের গান বেঁধেছে। মাঝে মাঝে গায়।

> তুই একটা ঢপের চপ মা
> মিছেই রঙ্গ দেখাস খালি
> তোকে বলেছিলুম গালি দেব মা গো
> তাই প্রতিজ্ঞো মতই বলছি শালী।

সেজদা বাড়ির বাইরে বেরোয় না। কিন্তু আজ বেরিয়েছে। কেউ দেখেনি। শুধু তৃপ্তি জানে। তৃপ্তি নাকি দরজা পর্যন্ত ধরে ধরে এগিয়ে দিয়েছে। তৃপ্তির কি এত বুদ্ধি আছে যে দরজার ওপারে কি হবে ভাববে? হয়তো বলেছে দুগ্‌গা দুগ্‌গা। আমাকে যেমন বলে।

রাস্তা থেকে হয়তো একটা ট্যাক্‌সি নিয়েছে। ওখানেই গেছে নিশ্চয়ই। আর কোথায় যাবে। ভাল্লাগে না। আর চিন্তা করতে পারি না। কিন্তু ভয় হচ্ছে আজ যখন বেরিয়েছে রাস্তায়, ঠিক ভাবে যদি ফিরে আসতে পারে, তাহলে সাহস পেয়ে যাবে, আবার বেরুবে, বেরুতেই থাকবে। আবার মালঝাল কিনবে, আবার ওই সব উপদ্রব হবে। আজ যেন একটা অ্যাকসিডেন্ট হয় ওর, যেন মাথা টাথা ফাটিয়ে আসে...।

ছাতে পায়চারি করছি, ভাবছি এবার বেরোব। খোঁজ খবর করতে হবে। এমন সময় রাস্তা থেকে সেজদার গলার স্বর শুনলাম। তিপ্তি... ও তিপ্তি নীচে এসো। দেখো কী এনিচি।

আমি ছাতের রেলিং থেকে ঝুঁকে দেখি একটা ট্যাক্‌সি দাঁড়িয়ে রয়েছে। ট্যাক্‌সিটার সামনে দাঁড়িয়ে সেজদা হাঁক মারছে। সেজদার সঙ্গে একটা ছোট বাচ্চা। বাচ্চাটাকে বুকে চেপে ধরে সত্য-ধামের ওপরের জানালার দিকে সেজদা চেয়ে আছে।

পাঁচ

রেডলাইট এরিয়া থেকে একটা ব্লাইন্ড বাচ্চাকে নিয়ে এল শিবু। আমাদের বংশের মান ইজ্জত কিছু রইল না। সত্যি কথা যদি বলি, আমি আমার বাবাকে দুষব। যখন মাল খেয়ে বাড়ি আসতো, বাবা কি জানতো না? একটা কসিয়ে থাপ্পড় মারতে পারতেন বাবা। বাবার উচিত ছিল শিবুকে এ বাড়িতে না রাখা। এই পার্মানেন্ট অশান্তির বীজ বাবার আমলেই পোঁতা হয়েছিল, এখন ডালপালা মেলেছে। বাজে মেয়েদের যাওয়া-আসা তো লেগেই ছিল, এখন আবার অন্য উৎপাত। সেদিন বাড়ির সামনে একটা গাড়ি এসে থামল, গাড়ি থেকে বেরুল দাড়িওয়ালা দুটি ছেলে, একজনের ঘাড়ে ক্যামেরা, আর প্যান্ট শার্ট পরা একটা মেয়ে। আমার নাতনিও এরকম প্যান্ট শার্ট পরতে শিখেছে। ওরা বললে কী যেন একটা টিভি চ্যানেলের জন্য শুটিং করবে। ওই সব রেডলাইট এরিয়াতে আজকাল নানারকম অর্গানাইজেশন হয়েছে, ওদের মাধ্যমে ওই টিভি চ্যানেল খবর পেয়েছে একটা ব্লাইন্ড বাচ্চাকে শিবচাঁদ মল্লিক নামের এক মহানুভব মানুষ নিজের বাড়িতে নিয়ে গেছে। ওরা সেই মহানুভব মানুষের ইনটারভিউ নেবে। প্রথমেই বাড়ির ছবিটা তুলতে লাগল। দেখি সাদা ফলকের সত্য-ধাম তুলছে। আমি দেখলাম ফ্যামিলি প্রেস্টিজ পাংচার হয়ে যাচ্ছে, তখন ওদের প্রটেস্ট করলাম। বললাম কার পারমিশন নিয়ে এই বাড়ির ছবি তুলছেন? ওরা তখন ছবি তোলা বন্ধ করে বলল কীভাবে পারমিশন নিতে হবে? আমি বললাম পারমিশন হবে না। ওরা বলল শিববাবুর সঙ্গে কথা বলবে। আমি বললুম কোনো কথা নয়। ওরা বলল তাহলে ওই অন্ধ বাচ্চাটিকে কোলে রেখে শিববাবুর ছবি তুলবে। আমি

বললুম হবে না। সেবারের মতো ওরা চলে গেল। ক'দিন পরে আবার অন্য পার্টি। আমি একতলায় থাকি বলেই আমার ঝামেলা। ওদেরও আমি ফোটাচ্ছিলাম, কিন্তু শিবু তখন ওদের সামনে পড়ে গেল। ও ওই বাচ্চাটাকে কোলে করে বেড়াতে বেরিয়েছিল। মেয়েটার মাথায় লাল ফিতের ফুল। লাল ফিতে এখন উঠে গেছে। কোত্থেকে জোগাড় করেছে কে জানে। নিশ্চয়ই দুলালের পাগলি বৌয়ের কারবার। ওর ছোটোবেলায় লাল ফিতের ফুল ছিল। সেটাই ধরে রেখেছে। শিবুর কোলে ওই বাচ্চাটাকে দেখে ওরা বলল আপনিই বুঝি শিববাবু, শিবু ঘাড় নাড়তেই ওরা বলল দেখুন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম, এই ভদ্রলোক কিছুতেই দেখা করতে দিচ্ছেন না। আমরা টিভির লোক, আপনার ছবি নেব, ইনটারভিউ নেব। শিবু বলল কেন? ওরা বলল আপনি যে একটা ব্লাইন্ড মেয়েকে তুলে এনেছেন...। শিবু বলল বেশ করেছি। কার বাপের কী। ওরা হকচকিয়ে গিয়ে বলেছিল না, তা তো ঠিকই, খুবই ভালো কাজ, তবে আপনি এটা করলেন কেন? শিবু বলল লে হালুয়া! করলাম কেন মানে? আমি বে-থা করিনি, বাচ্চা নেই। বাপ হওয়া হল না, কিন্তু দাদু হওয়া হল। মানুষের জীবনে নাতি হওয়াও দরকার, দাদু হওয়াও দরকার। এই যে আমার কোলে এই মেয়েটা, আমার বুকের ধুকপুকি ওর গায়ে লাগছে, আর ওর গায়ের গরম আমার বুকে।

টিভি কোম্পানির ছেলেটা বলল দারুণ বলেছেন। এখানে মেয়েটাকে কোলে নিয়ে দাঁড়ান, একটু আদর করুন, একটু বাইট নেব, মানে ছবি তুলব। শিবুকে দেখলাম হঠাৎ খেপে যেতে। বলে মাজাকি নাকি! আমার পার্সোনাল ব্যাপারে ছবি তোলার কী আছে। আপনাদেরও বলিহারি যাই। একটু দাদুবাজি করছি, সে বই তো কিছু নয়। এ আবার টিভিতে দেখানোর কী হল। আমি এসব ছবি টবি তুলব না। আপনারা আসুন। তবুও ক্যামেরা তাক করছিল একজন, শিবু তেড়ে গেল। ও যে কখন কী করে বোঝা যায় না। ওরা চলে যাবার পর শিবু আমায় চার্জ করল। শিবু বলল মেজদা, তুই কেন ওদের ফোটাচ্ছিলি, ফোটালে আমি ফোটাব। তুই কেন ওদের আমার

সঙ্গে দেখা করতে দিচ্ছিলিস না? এর আগেও তুই এই কেস করেছিস, আমি জানি। আমি বললাম ফ্যামিলি প্রেস্টিজের ব্যাপার। ওরা সত্য-ধাম লেখাটা ওঠাচ্ছিল...। শিবু বলল প্রেস্টিজ মারাস না। তুই যে ওষুধের দুনম্বরী কারবার করিস। ওখানে ফ্যামিলি প্রেস্টিজে বাধে না? আমি কিন্তু কাউকে বলিনি কোনো দিন, কারণ এতে আমার ফ্যামিলি প্রেস্টিজে বাধে।

হ্যাঁ, করতুম, জালি ওষুধ বানাতুম, এখন এসব লাইন ছেড়ে দিয়েছি। আমি শুধু বানিয়ে দিতুম, প্রোডাকশনের জন্য চার্জ করতুম। ওরা সাপ্লাই নিত, ওরা বিক্রি করত। আমার ভারত ফার্মাসিউটিকালের মেশিন আইড্‌ল পড়ে থাকে অনেক সময়, তাই বানিয়ে দিতুম। মাল-মেটিরিয়াল-ফরমুলা ওদের। ভিটামিন বড়ি, অ্যান্টাসিড, ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট এসব তৈরি হয়ে মেইনলি হসপিটাল সাপ্লাই হত। তাও মফস্বলের হাসপাতালে। গ্রামের ওষুধের দোকানেও কিছু কিছু দিত বোধ হয়। ওই মালে কোথাও ভারত ফার্মাসিউটিকাল ছাপ নেই, আর ওই মাল যে আমাকে দিয়ে করাচ্ছিল, সে হেভি হোল্ডবাজ লোক। ওর নাম ধরণীধর ঘোষ। ওর একটা মধুচক্র আছে সল্টলেক-এ। ওখানে পুলিশের বড়ো চাঁই, সরকারি বড়ো অফিসার, মন্ত্রীর পি. এ. এরা আসে। ধরণীবাবুর নিজের নাকি ম-এর দোষ নেই, কোনো বাবার শিষ্য, নিরামিষ খায়। বলেছিল ব্যবসা চালু রাখতে গেলে এসব করতে হয়। ওষুধের দু নম্বরী ছাড়া ও মূলত কন্ট্রাক্টার। পি ডাবুডি-র। ওর মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বে দিতে চেয়েছিল। অমিতাভ তখন আমার কোম্পানিতে বসে। ইনফ্যাক্ট প্রোডাকশনটা ওই দেখে। বলেছিল কোনো রিসক্ নেই, যা হবে ও বুঝে নেবে। হয়তো তাই। ওই কারবারে রিস্ক থাকলে কি কেউ জামাই করতে চাইত? বলেছিল একটা বাড়ি দেবে। মেয়েটাও দারুণ, লোরেটোর মেয়ে। আমিই রাজি হলুম না। আমার ভয় হল। ভাবলুম ওরকম ঘোড়েল শ্বশুরমশাইয়ের হাতে ছেলেকে দিলে ছেলে আমার কন্ট্রোলে থাকবে না। আমার বউ বিউটিও পক্ষপাতি ছিল না। ও কিছু কিছু ওই বিজনেসের ব্যাপারে আঁচ করেছিল। আমাকে বলত ওগো, অতি লোভ করতে যেও না অতি লোভে তাঁতি নষ্ট। একদিন রাত্তিরে ঘুমের

মধ্যে চিৎকার করে উঠল। আমারও ঘুম ভেঙে গেল। ও বলল স্বপ্ন দেখলুম অনেকজন মেয়েমানুষ আমার দিকে আঙুল তুলে বলছে তুই আমার ছেলেদের খেইচিস্, তুই ডাইনি। তুই খারাপ ওষুধ দিয়ে ছেলেদের মেরেছিস্। তোর ভালো হবে না। তোর ছেলের ভালো হবে না, তোর স্বামীর ভালো হবে না। এই বলে ওরা আমার গায়ে থুথু ছিটিয়ে চলে গেল। তারপরই দেখি আমার মা, মায়ের গলায় দড়ি, আর হাতে একটা গাঁদা ফুল। ফুল দিয়ে আমার গায়ের থুথু মুছিয়ে দিচ্ছে মা। তখন ঘুম ভেঙে গেল।

আমি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলুম—ওসব স্বপ্নের কোনো মানে নেইকো। ওসব নিয়ে ভেবো না। বিজনেস ইজ বিজনেস। ওটা হল কর্ম। কর্মযোগ। আমেরিকা কী করছে? বোম-বন্দুক-কামানের বিজনেস করছে। ওষুধের বিজনেসই যদি বলো তো বড়ো বড়ো কোম্পানি ওষুধের এক্স্‌পেরিমেন্ট করার জন্য আমাদের মতো দেশের মানুষের ওপর পরীক্ষা করাচ্ছে, কত লোক মরছে। ও তুমি বুঝবে না। ওষুধের বিজনেসে অত ভাবলে চলে না। বিউটি কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট হল না। বিউটি উদ্ধব ঠাকুরের ছবির সামনে বলতো বাবা, আমার স্বামীপুত্রর যেন কোনো বিপদ না হয়। এরপর আমাকে শুনিয়ে শুনিয়েই বলত বাবা, আমার স্বামী-পুত্রকে সুমতি দাও। একদিন একটা উড়ো ফোন পেলুম। বলছে আমি একজন ড্রাগ ইন্‌সপেক্টার বলছি। আমরা জানি আপনার দুনম্বরী কারবার আছে। একজনকে পাঠাচ্ছি, তার হাতে এক লাখ টাকা দেবেন, নইলে কেস দিয়ে দেব। ভাবলাম এক্ষুনি ধরণীবাবুকে জানানো দরকার। ওর বাড়িতে ফোন করলাম, ফোন বেজে যাচ্ছে। তখন তো আর মোবাইল ফোন চালু হয়নি, কোথায় আছে জানি না, ভাবলুম সল্টলেকের ওই মধুচক্রে যদি পাওয়া যায়। ঠিকানা ছিল। আমাকে অনেকবারই যেতে বলেছিল ধরণীবাবু। বলত আরে মল্লিক মশাই, একটাই তো জীবন, এনজয় করুন! এনজয় করুন! তা, আমি কোনো দিনই যাইনি ওখানে। সে দিন অগত্যা যেতে হল। গাড়ি নিয়ে ঠিকানা খুঁজে গেলাম, দেখি ওই বাড়ি থেকে আমার ছেলে বেরুচ্ছে। আমি স্ট্যাচু হয়ে গেলুম। তারপর মনে হল ছেলে কী ভাবল আমায়?

পরে জানতে পেরেছিলুম ওটা আমার পরিবারের কীর্তি। বিউটিই ওর বাপের বাড়ির কাউকে দিয়ে ভয় দেখানোর জন্য ফোনটা করিয়েছিল। যাই হোক, এরপরই আমি ধরণীবাবুর সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করি।

ছেলের বিয়ে দিলুম সমাজেই। ঘটক লাগিয়ে। ওইসব কম্পুটার ঘটক নয়, অনেক শিক্ষে হয়েছে দুলালের কেস-এ। মেয়েকে অনেক বাজিয়ে, ভিক্টোরিয়ার বাগানে মেয়েকে আনিয়ে, ছেলের সঙ্গে হাঁটিয়ে তবে এনেছি। ফুচকা খাওয়ার সময় মেয়ের হাঁ দেখে নিইছি। বিউটি ওর বেয়াইনকে বলেছিল শাড়ি নয়, সালোয়ার কামিজ পরিয়ে পাঠাবেন। তাতে পায়ের গোছ দেখতে সুবিধে হয়। যাই হোক। বৌমা হল। বিউটির সঙ্গে ভালোই পটছিল প্রথম প্রথম। এখন হচ্ছে ঝামেলা। বিজনেস পড়তির দিকে। এসব আদ্যিকালের ওষুধ চলে না। অ্যাসিড কিওর, ফাইটোকফ্, ভিটামিক্স্, এসবের দিন শেষ। আয়ুর্বেদিক ফর্মুলার ওষুধ, ড্রাগ লাইসেন্সের ঝামেলা কম। আমি যখন নিজে বিজনেস দেখতুম, তখন চালিয়েছি নানা কায়দা করে। ক্যানভাসার রাখতুম, ওরা গাঁয়ে-গঞ্জে চালাতো। এখন আর সেই গ্রাম নেই, তা ছাড়া অমিতাভটা পারছেও না। বলছে লজেন্স-টফির কারবার করবে। ওই এক মেশিনে প্রথমে হত কালির বড়ি, তারপর ন্যাপথালিন, তারপরে ওষুধ বড়ি, এবার লজেন্স। সবই তো ট্যাবলেট। একেই বলে জার্মান মেশিন। এজন্যই সেকেন্ড ওয়ার্লড ওয়ারের সময় বাবা হিটলারের সাপোর্টার ছিল। আমিও যদিও তখন ইস্কুলে পড়ছি। বিজনেসটা ডাউন হওয়াতেই বাড়িতে ঝামেলা। স্ট্যান্ডার্ড হাই করে ফেলেছিল ছেলে, এখন কুলোতে পারছে না। জমি কিনে রেখেছিলুম বাগমারিতে, বাড়িটা করতে পারিনি। ছেলে বলছে জমিটা বেচে ফ্ল্যাট কিনবে। আমি বলি এ কম্ম করিসনি। ফ্ল্যাটে ভদ্দরলোক থাকে? অমিতাভর ছেলেমেয়ে বড়ো হচ্ছে। ওদের মাস্টার আসে, বন্ধু-বান্ধব আসে। এখন আর একটা ঘরে পোষায় না। তা ছাড়া বউ-শাশুড়ির মধ্যে একটু গ্যাপ থাকা ভালো। এজন্য ভাবছি বাড়ির অ্যারেঞ্জেমেন্ট একটু চেঞ্জ করতে হবে। এক তলাটা শিবু দুলালদের

থাকতে বলি। দুলাল আর ওরা পাগলি বউয়ের একটা ঘর, শিবুর একটা। আর একটা একস্ট্রা। বাচ্চাটা কার কাছে থাকবে? শিবুর কাছে নাকি দুলালের বউয়ের কাছে? কে জানে? যেখানে খুশি থাক। ভাবছি এক তলাটায় ওদের দিয়ে, দোতলায় কুটুকে থাকতে বলব, তিনতলায় আমি চলে যাব। দোতলা তিনতলায় চারটে করে ঘর আছে। তিনতলার ছাদে ছোটো করে না হয় আরও দুটো ঘর করে নোবখনে, ওখানে দরকার হলে বিউটি আর আমি থাকব। কতকাল তিনতলার ছাতে ওঠা হয় না। সে একদিন ছিল। কতবার ছাতে উঠতুম। মুনুও উঠত। আমি 'একপলকে একটু দ্যাখা' কিংবা 'আমি দূর হতে তোমারেই দেখেছি' গাইতুম। তখন আমার কী চুল ছিল। উত্তমকুমারের মতো সামনেটা ফোলা। তখন বডি বিল্ডিং করতুম। মুনু ওদের ছাত থেকে পাউরুটির ঠোঙায় করে ফুল ছুঁড়ে দিত আমাদের ছাতে। দুটো চিঠিও দিয়েছিল। সে একদিন গেছে বটে। মুনুর বিয়ের বছর ঘুরবার আগেই ওর হাজবেন্ড মারা গেল বাচ্চা-কাচ্চা হয়নি ওর, বিধবা-যোগ ছিল কি না কে জানে? ভাগ্যিস ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি। মুনু এখন এখানেই থাকে। ওর বাপের বাড়িতেই। কতকাল দেখিনি ওকে।

কুটুর সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে। ওর কোনো আপত্তি নেই। থাকার কথাও নয়। দুলাল-শিবু পার্টি যত দূরে থাকে ওর ততই ভালো। কেসটা আমাদের দুজনের মধ্যে ফয়সলা হয়ে গেছে। দুলালও রাজি হয়ে যাবে মনে হয়। ওই শিবুই ব্যাগরবাই করবে। ওকে সবাই মিলে রাজি করাতে হবে। ভাবলুম ছাতটা একবার দেখেই আসি, ছাতের কী অবস্থা। কী করে রেখেছে ওরা। বহুদিন ওপরে উঠিনি। ওপরে উঠতে গেলে কত কথা মনে পড়ে। সব ইতিহাস। কত দিন সিঁড়ির দেয়ালে চুনকাম হয়নি। সারা দেয়াল জুড়ে কি সব আঁকিবুকি। দোতলার লোকরা কোথায় গেল? শিবু বোধহয় টো টো করছে। কিন্তু বয়স তো হচ্ছে, এই শরীরে পারে কি করে কে জানে? আমার তো দোতলা উঠতেই হাঁপ ধরে গেল। হার্টের একটু হয়ে আছে। ছাতে

উঠলাম। সেই ছাত। কতদিন পরে, ছাতে উঠলেই একদম সামনেই হাওড়ার ব্রিজটা দেখা যেত। এখন আর হাওড়ার ব্রিজ দেখা যায় না। একটা লম্বা বাড়ি গার্ড করে দিয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই দুলালের বউয়ের গলা শুনতে পাচ্ছি।

আর বোলো না মাসি যা দুষ্টু হয়েছে না...। সব বোঝে, জানো তো, বাইরেটা দেখতে না পেলে কি হবে, ভেতরটা দেখতে পায়... দেখি দুলালের বউ ছাতের ওপাশের ছাতের রেলিং-এর সামনে দাঁড়িয়ে মুনুর সঙ্গে কথা বলছে। মুনু তো নয়, মনোরমা। সমস্ত চুল পেকে গেছে। থান শাড়ি। গায়ে ব্লাউজ নেই। আমায় দেখে কাপড় জড়ালো। ব্যাস্, আর কোনো তাপ-উত্তাপ নেই ওর। এখানে দাঁড়িয়ে এক পলকে একটু দ্যাখা আর একটু বেশি হলে ক্ষতি কি কি করেছি একদিন। কবে? হয়তো পঞ্চাশ বছর আগে। তখন কলকাতার আকাশে অনেক পাখি ছিল। মুনু একবারও আমার দিকে তাকাচ্ছে না। অ্যাই মুনু, তুই কি লিখিছিলি?—আমার এয়ারকি দিতে ইচ্ছে হল। কতদিন পরে ফাজলামি জেগে উঠছে। গাইব নাকি—ওগো প্রিয়তমা। করিও ক্ষমা। তোমাকে আমার দোসর করিতে পারিলাম না। ও-গো প্রিয়তমা...। মুনু ওই বাচ্চাটার দিকে চেয়ে হাসছে। ওর সামনের দাঁত পড়ে গেছে। ওর ভ্রূক্ষেপ নেই। ইশ্, ওর দাঁত বাঁধিয়ে দেবার কেউ নেই। আমারও তো চারটে দাঁত বাঁধানো। ওর দাঁত আমি বাঁধিয়েই দিতে পারি, দিতে পারলে খুশিই হতাম কিন্তু এটা কি এখন আর বলা যায়? কলকাতার আকাশে পাখি কত কমে গেছে।

এখন বোধহয় বেলা প্রায় বারোটা মতন হবে। রোদ্দুরটা মন্দ লাগছে না। ঠাণ্ডা পড়েছে ক'দিন। ছাতে একটা আদ্যিকালের চেয়ার। ওখানে বসে মনোরমা বোধ হয় রোদ পোহাচ্ছিল। মুনু বলছে—একটু ফলের রস করে খাওয়াস। দুলালের বউ বলছে—সে কি আর দিই না ভেবেচ মাসি, সব দি। সকালের রোদ্দুর দি, চাঁদের জোছনা দি, শুধু তারার জলটা দিতে পারিনি কো।

মনোরমা জিজ্ঞাসা করল নাম কি রেখেছিস?

ওর নাম ছিল সুকন্যা। আমার ওই নাম ভালো লাগে না। ওর নাম দিইচি সোনালি। কী মাসি ভালো না?

মনোরমা বলল সেই ভালো।

আমিও মনে মনে বলি সেই ভালো। কুটুর মেয়েটার নামও সুকন্যা। এর নাম সুকন্যা হলে কুটু কি মনে করত!

মনোরমা দু হাত বাড়ালো। ও তো অন্য বাড়ির ছাতে। ফকির মিত্র লেন-এর ওপারে। বারো ফুটের তফাত। তবু ও হাত বাড়িয়েছে। দুলালের বউ বলছে যাবি, দিদার কোলে যাবি? বাচ্চাটা হাসছে। বাচ্চাটার হাসি দেখে মনোরমার মাড়ি বেয়ে হাসি ঝরছে। ওর গালে বলিরেখা, চুল সাদা, দাঁত নেই, কিন্তু ওই হাসিটায় সায়গল-যমুনাবড়ুয়া-স্টার থিয়েটার-ভীমনাগ মিশে আছে।

রোদ্দুরে পড়ে আছে একটা কালচে কাঠের চেয়ার, চেয়ারে উলটানো একটা খয়েরি মলাটের ছেঁড়া ছেঁড়া বই। ওটা শরৎবাবুর বই। আমি জানি। এমন সময় কয়েকটা পটকার শব্দ। এ বাড়ি ও বাড়ি থেকে শাঁখ বেজে উঠল। ও! আজ বুঝি ২৩শে জানুয়ারি। হাতটা কপালে ঠেকালাম। দেখলাম মনোরমাও কপালে ঠেকাল হাত। আমাদের ছাদের ওই কোণাটার দিকে তাকালাম, সেখানে আমরা পঞ্চাশ বছর আগে পতাকা ওড়াতাম এই দিনে। শিবুও কি আজকের দিনটা ভুলে গেল?

মনোরমা ও বাড়ি থেকে বলছে—ও কাকে সবচেয়ে ভালেবাসে গো?

দুলালের বউ বলল আমাকে।

মা ডাকতে পারে?

হ্যাঁ—এ—এ—এ—

চোখের চিকিৎসা করাওনি?

তা কি আর হয়নি? কত ডাক্তার দেকিয়েছে,

কত ওষুদ খাইয়েচে...

ওষুধে কাজ হয়নি তো? হবে কি করে? ওষুধ কি খাঁটি আছে? ওষুধে তো ভেজাল।

আমি এবার কোণার দিকে চলে যাই। অন্য কোণায়। মনোরমার দিকে তাকাব না। ও কি প্রতিশোধ নিল? হাওড়ার ব্রিজ দেখা যাচ্ছে না, মদনমোহনের মন্দির দেখা যাচ্ছে না। আমার ওই ঘুড়ি ওড়ানোর ছাদ, ঠোঙা ছোঁড়ার ছাদ, লুকিয়ে সিগারেট খাওয়ার ছাদের স্কোয়ার ফুট হিসেব করি।

দুলালের বউয়ের কথা শুনতে পাচ্ছি। মনোরমাকে বলছে—ওষুধে কাজ না হোক গে, ওর চোখ কিন্তু ফুটবে। হাওয়া আসবে, সে হাওয়ায় চোখ ফুটবে। যে হাওয়ায় কুঁড়ি থেকে ফুল ফোটে সে হাওয়া চোখেও লাগবে।

এমন সময় শিবু এল। বলল কই গো বৌমা, ছুকুমুনু-কে একটু দাও দেকি, ওর জামায় এটা লাগিয়ে দি। নেতাজীর ব্যাজ। কদম কদম বাড়ায়ে যা খুশি কি গীত গাহে যা... পমপম্ পমপম...।

ছয়

মনতুনুনতু সুনতুটার চোখ ফোটেনিকো, চোখ ফোটাতে হবে। চোখ ফুটলেই ফুল ফুটবে। যে ফুল ফোটায়, তাকে বলিচি আমার সোনাটার চোখ ফুটিয়ে দাও, ও তবে না দেখতে পাবে আমাকে। মা দেখেচিস তুই? তোর মা গলায় দড়ি দিয়ে মরেচে। এখন তোর মা কে বলতো? আমি। আমার স্বামীকে তুই বাবা ডাকবি না বলে দিলুম। স্বামীর যে সেজদা, ওকে তুই বাবা ডাকবি বলে দিলুম। সে তোকে গান শোনাবে। এখন শোনায় না বুঝি? এখানে তো শোনায়। কাল তোর নাম রেকেছিলুম সোনালি আজ তোর নাম রাকলুম গুজরাটি। না, এটা ভালো নাম নয়, তা হলে দিব্যা ভারতী। দিব্যা ভারতী সুইসাইট করেছিল। তুই এসব করতে য়্যাস না বলে দিলুম। আমিও করব না, তুইও করবি না। তোর সেজদা-বাবাও সুইসাইট করবে না। আমরা কেউ করব না। একটা ভাঁড় কিনিচি। মাটির ভাঁড়। মাটির ভাঁড়ে তোর বাপ্‌কে বলেচি রোজ রোজ পয়সা ফেলতে। মাটির ভাঁড় যখন ভর্তি হয়ে যাবে, তখন আবার একটা মাটির ঘট ভর্তি হবে। সব তোর জন্য। তোর মুখে মা ফুটেছে। মেহবুবা মেহবুবা। ওলে ওলে। এক দো তিন চার পাঁচ ছে সাত আট নয়...।

একতলায় থাকে মেজবউ। ওর নাম আবার বিউটি। বিউটি? ছাই। আমার মেয়ের নাম তবে করিশমা কাপুর। না কাজল। কাজল। ইলাটিং বেলাটিং সই লো, কীসের খবর আইলো, রাজা একটি বালিকা চাইল। কোন বালিকা চাইল? কাজল বালিকা চাইল, দেব না দেব না দেব না। ইশ, চাইলেই হল! দেব কেন?

বিউটিবউকে বলে দিইচি আমার মেয়েকে তুমি ছোঁবে না। তুমি ওকে তুক করবে। তখন চোখ চাইলে তোমায় মা ভাববে। এখন তো ওর চোখ

নেই। ও তো বুঝতে পারছে না কে ওর মা। আমি বলেদিলুম কিন্তু, মল্লিক বাড়ির সবাইকে ওয়ার্নিং দিয়ে দিলুম কেউ আমার পোঁদে লাগতে এসো না, তুকতাক করতে এসো না। যদি পারো তো তারার জল এনে দাও। আমাকে মা সরস্বতী স্বপ্ন দিয়েছে। বলেছে আকাশের তারায় যে বিষ্টি হয়, সেই বিষ্টির জল চোখে ছোঁয়ালে চোখ ভালো হয়ে যাবে।

কবে সে জল আসবে তারাদের দেশ থেকে?

আমার মায়ের গন্ধ বড়ো ভালো ছিল, আমার আসল মায়ের। ছাতের কোণায় আমার মায়ের ঘোমটা পড়ে আছে। সব নেই, খালি ঘোমটা পড়ে আছে। দাদা হাতে আগুন আর শাঁড়াসি ধরল। নেড়া হল, ক'দিন পরে বাবা বলল—এই নে মা, নতুন মা। নতুন মা আমাকে কখনও পুতুল দেয়নি। যেদিন আমার লজ্জা লজ্জা রক্ত বেরুল, নতুন মা ফস্ করে পুরনো শাড়ি ছিঁড়ে বলেছিল দেখে নে, এভাবে বাঁধবি। খুব ব্যথা লেগেছিল। আমি বড়োই হতে চাইনি। বড়ো হলাম বলেই তো ঝামেলা হল আমার।

নতুন মা বলত, বাড়ছে কেমন, ফ্রকে ডবল ঝালরেও বুক ঢাকে না। ইস্কুলে আমার যেতে খুব ভাল্লাগত। আলুকাবলি খেতাম, বেঞ্চির ওপর দাঁড়াতাম, কান ধরতাম, কত রকমের মজা। কিন্তু আমি ফেল করতাম। একদিন আমাদের ইস্কুলের জমাদার আমার বুক ধরল। জমাদার ছুঁলে তো চ্যান করতে হয়। আমি বড়দিকে বলি ছুটি দিন দিদি, জমাদার ছুঁয়েছে। তারপর সব বলি। বড়দি মাকে ডেকে বলে, তারপর মা বলে, আর ইস্কুলে যাবি না। আর ইস্কুলে যাই না। জমাদার যা করেছিল—সেরকম আরও অনেকে করেছে। মাকে সব বলিনি। ওদের অনেক দিন দেখিনি। কাউকে কাকা ডাকতাম, কাউকে মামা ডাকতাম। আর বাসে যে লোকগুলো ওরকম করে, তাদের তো মুখই দেখতে পাই না। যখন ইস্কুল ছাড়াল, যখন বাড়ি থাকতুম, তখন একা একা কথা কইতুম। চাঁদের সঙ্গে কথা কইতে খুব ভালো লাগত। এখনও ভালো লাগে। চাঁদের জন্য কষ্ট হয়। ওর গা থেকে সব জোস্না বেরিয়ে যাচ্ছে বলে কষ্ট হয়। চাঁদের ভিতরে গুহা আছে। ইস্কুলে বলেছিল। গুহার ভিতরে কিছু জোস্না লুকিয়ে রেখো চাঁদ। পরে দিয়ো আমার সোনামণিকে দিও।

আমার মাথা ধরলে চাঁদ আমার মাথা টিপে দেয়। কোনো কোনো দিন চাঁদ আমায় ওর নখ দিয়ে আমার মাথার চুল ছেঁড়ে। চাঁদেরও মন খারাপ হয়। কাল হয়েছিল। জিগ্যেস করেছিলাম চাঁদ, তোমার মন খারাপ কেন? চাঁদ বলেছিল দেখো না, আমার গায়ে কারা যেন মাংস চিবিয়ে ফেলেছে।

একদিন, সেটা অনেকদিন আগে, চাঁদের সঙ্গে কথা বলছি, ঠিক সন্ধেবেলা, তখন নীচের থেকে কান্নার শব্দ। নেমে দেখি বাবা মরে যাচ্ছে।

আমার স্বামীর গাড়ির কারবার। গাড়ি বানায়। গাড়ির গায়ে ডানা লাগিয়ে গাড়ি ওড়াব। উড়িয়ে বাবার কাছে যাব। বলব বাবা, ও বাবা, আমাকে তারার জল এনে দাও।

আমার স্বামী খুব ভালো লোক। আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। আমাকে পাগলি বলে। আদর করেই তো পাগলি বলে, তাই না? আমার বাবা আমাকে বলত। সেজদাও বলে। মেয়েটাকে পাগলি বলে। আমার স্বামী অন্য ঘরে শোয়। আমি তো ঘুমের মধ্যে বকবক করি, ঘুম আসে না কি না, তাই ঘড়ির সঙ্গে কথা বলি, রাস্তার লাইটের সঙ্গে কথা বলি, তাইতো আমার স্বামীর ডিস্টার্ব হয়। মাঝে মাঝে আমার স্বামীর ওপর রাগ হত। আমার বাচ্চা দিচ্ছিল না বলে। তারপর একদিন দেখলুম মেজ বউ তুকতাক করছে। তাইতেই স্বামী ওরকম পানা করছিল।

আমি লক্ষ্মীর পাঁচালি পড়ি। এতদিন পড়তুম না। এখন পড়ি। লক্ষ্মী পুজো করি। এতদিন করতুম না। এখন করি। এখন সংসার হয়েছে বলে করি। স্বামী আছে, বাচ্চা আছে, আমি আছি। পুরো সংসার হয়ে গেল। আগে ছিল না। মেয়ের বাবা কিন্তু উপরে থাকে। চিলেকোঠার পাশে। সেজদা। মেয়ে নিয়ে আমি নীচে। পাশের ঘরে স্বামী। আমার ওপর নিচ জোড়া সংসার। আর অন্যসব লোকজন, দূরের, যাদের চিনি না এখনও, যারা আমার মেয়ের চোখ ফোটাবে বলে চুপি চুপি কাজ করছে, তারাও আমার সংসারের লোক। তোমরা সবাই আমার বাড়িতে এসো, বাতাসা খাওয়াব, তখন এই বাড়িটা অবন্তীনগর হয়ে যাবে। লক্ষ্মীর পাঁচালিতে প্রতি বেস্পতিবার অবন্তীনগর পড়ি যে...।

সাত

সব ভুলগুলো মিলিয়ে একটা ফুল বানিয়েছি আমি।
এ্যাইসা ফুল বানায়া
উনকো গুস্‌সা আয়া...।

হে বি দাদুবাজী করছি এখন। হেব্বি।

এবারে আমি তাসের টেক্কাটা ফেলব। শেয়ারের কাগজ। একটা শেয়ার কিনে রেখেছিলুম বিশ বছর আগে। মালতীর ঘরের আলমারিতে ছিল। ওটা নিয়ে এসেচি, যেদিন আমার নাতনিটাকে আনলাম। এখন আমার আলমারিতে রয়েচে। কোনো শালা ভাই এ খবর জানে না। জানলে লাফাবে। ওটা ছাড়লে কত হবে ঠিক জানি না, তবে হবে, কিছু হবে। পঞ্চাশ ষাট হাজার তো হবেই। নাতনিটার জন্য রেখে দিইচি শালা। হ্যাঁ, ওটাতো আমার নাতনি, দুলালের বউ বলে এটা আমার মেয়ে। পাগল আর বলেছে কেন। তবে সংসারটা ভালোই জমেছে। আমি, দুলালের বউ আর করিশমা কাপুর। দুলাল তুই ফোট। তুই আগের মতো ঝাণ্ডা লড়া গে যা।

আমি শালা আমার কনডেম মেশিন নিয়ে বসে আছি, হার্টটা বিট্রে করছে, কিডনিটায় নাকি লোডশেডিং হয়েছে, লিভারটাকে মাল খেয়ে আগেই পলিথিন বানিয়ে দিয়েছি। পায়ে ঝিঁঝি, হাতে ঝিম, ফুসফুস ঝাঁঝরা কিন্তু মাথার ভিতরে ঝঙ্কার কেবলই ঝঙ্কার—বাঁচব।

ওর চোখ ফুটুক, তবে যাব। এই যে এত কিছু হচ্ছে, ঘরে বসে আমরা দেখছি চাঁদের পাহাড়, আফ্রিকার বৃষ্টির ছাঁট আমার ঘরে ঢুকছে, পুঁচকে পুঁচকে শিশিতে ভরে দিচ্ছে আশ্বিনের শেফালি, আমার সোনামণিটাকে কি দেখাতে পারব না। দেখ, তোর নতুন মা, তোকে কত ভালোবাসে, দেখ, আমিও।

কই গো বৌমা তুমি কোথায়? শোনো। আমি এখনই যাব না। কেন যাব? ফুটে ওঠা দেখে তবে যাব।

কি করছ তুমি বৌমা? ছাদের ট্যাঙ্কের পাশে, কোণায়, গোপনে? বাচ্চাটা নিয়ে? আঁচল সরিয়েছ তুমি?

টেলিফোনের তারে ঝিনঝিন শব্দ। ঝিনচ্যাগ ঝিন।

কিছু আসবে বলে? কিছু কি আসছে?

আমারও যে মাইরি জল আসছে চোখে।

আমার ঘরের কোণায় পড়ে থাকা দুলালের ন্যাতানো ঝাণ্ডাটা দিয়ে আমার চোখের জল মুছলাম।

—ঝাণ্ডাটা নড়ে উঠল।

ডমডম ডিগা ডিগা। মৌসম বিগা বিগা।